কেশবচন্দ্র



ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স

তিন-আনা-সংস্করণ "কল্পতরু" গ্রন্থাবলী নং ৫

বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক
লাইব্রেরী ও প্রাইজের জন্য নির্দ্দিষ্ট। (কলিকাতা
গেজেট, ১৩ই আগষ্ট, ১৯১৯)

কেশবচন্দ্র

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥"

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime."

বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, রাজা রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র,
সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ প্রভৃতি রচয়িতা
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
কলিকাতা ও ময়মনসিংহ

১৩২৭

মূল্য তিন আনা

কলিকাতা
৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং
১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, স্বর্ণপ্রেসে
শ্রীকরুণাময় আচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।



কেশবচন্দ্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাঁটাবনের ভিতরে বেলফুলটি ফুটিয়া থাকিলেও যেমন তাহা চাপা থাকে না—গন্ধে প্রকাশ হইয়া পড়ে, তেমনি বালকবালিকাদের ভিতরেও কারও কোন সদ্‌গুণ থাকিলে, তাহার স্বভাবেই তাহা আপনা হইতে প্রকাশ পাইয়া সকলের চক্ষে ধরা পড়িয়া যায়। কেশবচন্দ্র যে ভবিষ্যতে একজন মস্ত লোক হইবেন—তা তাঁর শৈশবেই সকলে বুঝিতে পারিয়াছিল।

আলোকের পাশে অন্ধকার, মেঘের কোলে বিদ্যুৎ, দিনের পর রাত্রি যেমন প্রকৃতির নিয়ম, তেমনি বিধাতার নিয়মে এ সংসারে সকল মানুষই দোষ-গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। কেবল মাত্র গুণরাশির অবতার হইয়া কিম্বা খালি দোষের সমষ্টি লইয়া কেহই এ পৃথিবীতে আসে না। শৈশব হইতে যে ব্যক্তি পিতামাতা ও গুরুজনের আদেশ মান্য করিয়া কর্ত্তব্যের পথে চলিতে থাকে, তিনিই ভবিষ্যতে বড় হইয়া—স্বভাবের দোষগুলি জয় করিয়া গুণবান্ হইয়া উঠেন—এবং কালে পৃথিবীতে সকলের পূজনীয় হইয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন।

এইরূপে পৃথিবীর সকলদেশে সকলজাতির ভিতরে কত লোক যে সামান্য অবস্থায় জন্মিয়া নিজের চেষ্টায় বড়লোক হইয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, ইতিহাসে তাহার রাশি রাশি প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্গদেশেও বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, রাজা রামমোহন প্রভৃতি বিস্তর লোক এইরূপে বড় হইয়া জগতে প্রাতঃস্মরণীয় নাম রাখিয়া

গিয়াছেন। কেশবচন্দ্রও তাঁহাদেরই মত বঙ্গদেশের একটী উজ্জ্বল রত্ন। যতদিন ইতিহাস থাকিবে—তাঁহার গৌরব-গাথাও অমর হইয়া থাকিবে।

কেশবচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষের বাসস্থান—'গৌরীভা' গ্রামে। সেখান হইতে তাঁহারা কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন এবং সৎস্বভাব, ধর্ম্মনিষ্ঠা, সত্যনিষ্ঠা, উৎসাহ ও পরিশ্রমের গুণে ব্যবসা-বাণিজ্যে দিন দিন উন্নতি করিয়া কলিকাতার কলুটোলায় বাড়ী-ঘর তৈয়ারী করিয়া ফেলেন।

যখন ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি হইল, দশজন লোক প্রতিপালিত হইতে লাগিল, বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন হইতে চলিল, সহরে ঘর-বাড়ী হইল, তখন সেখানে সেনগোষ্ঠীর পসার-প্রতিপত্তি এবং দবদবা স্থাপিত হইল—দেশময় নাম ডাক ছড়াইয়া পড়িল, সামান্য 'গৌরীভা' গ্রামের সেই নগণ্য সেন পরিবার রাজধানী কলিকাতা সহরে গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন। কলুটোলার 'সেনেদের' নাম দেশবিদেশে কাহারও কাছে আর বড় অপরিচিত রহিল না।

তখন সে পরিবারের কর্ত্তা—রামকমল সেন। তিনি বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান্, সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, সাহসী, পরিশ্রমী এবং ধার্ম্মিক, সুতরাং মানুষের জীবনে উন্নতি করিতে হইলে যে যে গুণ থাকা আবশ্যক সে সকলই তাঁহার ছিল। তার উপর ধর্ম্মের মধুর আলো পড়িয়া তাঁহার সংসার উজ্জ্বল পুণ্যের সংসার হইয়া উঠিয়াছিল।

রামকমল সেন 'গোঁড়া বৈষ্ণব'। একথা বলিতে এখন আমরা যা বুঝি—সে রকম নহে, প্রকৃত বিষ্ণুভক্তের যা কিছু থাকা উচিত—সে সকল সদ্‌গুণই তাঁহার ষোল-আনা রকম ছিল, সুতরাং গৃহে নিষ্ঠাচার, পবিত্রতা, দেব-আরাধনা সর্ব্বদাই অনুষ্ঠিত হইত,—বারো মাসে তের পার্ব্বণ লাগিয়াই ছিল। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় মধুর হরিনামের রোল

উঠিয়া সে পল্লীটি মাতাইয়া তুলিত, তাহাতে অনেক লোক আকৃষ্ট হইয়া সেখানে জড় হইতেন।

দান-ধ্যান, ক্রিয়া-কলাপ, অতিথিসৎকার, দরিদ্রের সেবা প্রভৃতি সেকালের সকল গৃহস্থঘরে ছিল বটে, কিন্তু রামকমলের মত যথার্থ মনে-প্রাণে এ সকল কার্য্য করিতে বড় কাহাকেও দেখা যাইত না। তিনি বৈষ্ণব—হরিনাম শুনিলেই গলিয়া যাইতেন, সমস্ত প্রাণীকেই ঈশ্বরের সন্তান ভাবিতেন, সুতরাং প্রাণ দিয়া লোক-সেবা করিয়া তিনি আপনাকে ধন্য ভাবিতেন এবং ঈশ্বরের কার্য্য করিতেছেন ভাবিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেন। এইরূপে সর্ব্বজীবের প্রতি ভালবাসা তাঁহার জীবনের প্রধান অলঙ্কার স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

গাছ যেমন—ফলও তেমনিই হইয়া থাকে। সংসারে কর্ত্তার স্বভাবচরিত্র ও প্রকৃতি যেমন লোকজনও তেমনি হয়। রামকমলের আদর্শে তাঁহার সংসারও ধর্ম্মের সংসার—পুণ্যের সংসার হইয়া উঠিল। নিত্য উৎসব—নিত্য হরিনাম—নিত্য অতিথি-অভ্যাগতের সেবা—নিত্য দান-দক্ষিণা ক্রিয়া-কলাপ চলিতে লাগিল, সুতরাং দেশের মধ্যে রামকমল সেনের নাম-ডাক না পড়িবে কেন?

যিনি ধার্ম্মিক, যিনি পরহিতৈষী, যিনি সত্যনিষ্ঠ—কর্ত্তব্য-পরায়ণ, ভগবান তাঁহাকে তেমনি অমূল্যবস্তু পুরস্কার দিয়া থাকেন। রামকমল সেনের পুত্র প্যারীমোহন সেন মহাশয়ও পৈতৃক সদ্‌গুণ রাশির অধিকারী হইয়া সকলের স্নেহপাত্র হইয়া উঠিলেন। 'ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী লাভ' যাহাকে বলে রামকমল সেনের তাহাই হইল।

ইংরাজী ১৮৩৮ সালে ১৯শে নবেম্বর তারিখে রামকমল সেনের পুত্র প্যারীমোহন সেন মহাশয়ের যে পুত্র-সন্তান জন্মিল, তিনিই **কেশবচন্দ্র সেন** নামে বাঙ্গালায় অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরশমণির স্পর্শে রাংও সোণা হয়। চোরের সঙ্গে থাকিলে অতি বড় সাধুপুরুষও যেমন ক্রমে ক্রমে কালে চোর হইয়া পড়ে, তেমনি সৎসহবাসে অতি হীনচরিত্র ব্যক্তিও ক্রমে ক্রমে সাধু হইয়া উঠেন। বিশেষ, বাল্যকাল হইতে যিনি যে রকম লোকের সহবাসে দিন কাটান ভবিষ্যতে তিনিও সেই রকম স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

লোহা পুড়িলে গরম—লাল হইয়া অত্যন্ত নরম অবস্থায় থাকে। যতক্ষণ সে সেই ভাবে থাকে—ততক্ষণ তাহাকে যেমন ইচ্ছা পিটিয়া গড়ন করা যায়, কিন্তু একবার জুড়াইয়া শক্ত হইয়া গেলে তখন হাজার চেষ্টাতেও আর নোয়ানো যায় না—সুতরাং গড়ন করা অসম্ভব হইয়া উঠে—জোর করিতে গেলে ভাঙ্গিয়া যায়।

মানুষও ঠিক সেই রকম। প্রথম বাল্যজীবনে তাহার মন ঠিক গরম লোহার মত অত্যন্ত কোমল থাকে। তখন তাহাকে যে রকম শিক্ষা দেওয়া যায়—চক্ষের উপরে যে রকম আদর্শ দেখানো যায়, যে রকম সহবাসে তাহার দিন কাটে—বড় হইলে তাহার স্বভাবও ঠিক সেই প্রকার হইয়া দাঁড়ায়। সেই জন্যই—চোরের ছেলে চোর এবং সাধুর পুত্র সাধু হইয়া থাকেন।

কেশবচন্দ্র যে সংসারে জন্মিলেন—তাহা পরম পবিত্র বৈষ্ণবের সংসার—সেখানে অহোরাত্র কেবল ধর্ম্ম-চর্চ্চা এবং সৎকার্য্য সকল আচরিত হইতেছে। তাঁহার পিতামহ রামকমল সেন মহাশয়ের তো কথাই নাই—তাঁহার পিতা প্যারীমোহন সেন মহাশয়ও পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধু-পুরুষ। তার উপর তাঁহার গর্ভধারিণীও পরম সতী, গুণবতী ও ধার্ম্মিকা—আদর্শ-রমণী। সংসারের লোকজন—মায় চাকর দাসীটি পর্য্যন্ত সকলেই সেই উচ্চ আদর্শে গঠিত। সুতরাং তেমন পবিত্র

উচ্চবংশে জন্মিয়া—তেমন আদর্শ বাপ-ঠাকুরদাদা ও জননী পাইয়া—অহোরাত্রি আশেপাশে উজ্জ্বল সৎ-দৃষ্টান্ত সকলের মধ্যে থাকিয়া—শৈশব হইতেই তাঁহার মন, প্রাণ, প্রবৃত্তি ও দেহ সেইরূপ ভাবে গঠিত হইতে লাগিল।

একরত্তি কচি ছেলে—মায়ের কোলে স্তনপান করিতেছেন, এমন সময়ে বাহিরে খোল-করতাল বাজিল—মধুর হরিসংকীর্ত্তনের রোল উঠিল—তিনি স্তন্যপান ছাড়িয়া বিভোর হইয়া শুনিতে লাগিলেন। বায়না ধরিয়াছেন—কেউ ভুলাইতে পারিতেছে না—সংকীর্ত্তনের রব কাণে গেল, অমনি বায়না ভুলিয়া আন্‌মনা হইয়া পড়িলেন। অতিথি-ফকির সাধু-সজ্জনের সেবা হইতেছে—দাসদাসীর কোলে থাকিয়া দেখিতে দেখিতে শিশু এমন তন্ময় হইয়া পড়িল যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা রহিল না। সে সময়ে কেহ জোর করিয়া সেখান হইতে সরাইয়া লইয়া গেলে—কোল হইতে সেই দিকপানে অনবরতঃ ঝুঁকিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহাতেও যদি কেহ তার মনের ভাব না বুঝিতে পারিল, তখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া কান্না জুড়িয়া দিল।

তা ছাড়া—শৈশব হইতেই এমন শান্ত গম্ভীর ও ভাবুক প্রকৃতি যে, যেখানেই বসাইয়া রাখ—সেই খানেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, হাতে যে খেলানাটা দাও—তাহাতেই মগ্ন হইয়া গেল। ঘ্যান্—ঘ্যান্—প্যান্ প্যান্—ছট্ ফট্ প্রভৃতি বাল্যকালের সাধারণ চঞ্চল প্রকৃতি শিশুর অঙ্গে ছায়াটুকু পর্য্যন্ত ছোঁয়াইতে পারিল না।

এইরূপে যতই দিন কাটিয়া বয়স হইতে লাগিল, ততই দিন দিন শিশুর সেই ভাব বাড়িতে লাগিল, ক্রমেই অধিকতর ঠাণ্ডা এবং বেশী রকম ভাবুক হইয়া উঠিল। সাধারণ লোকে 'বোকারাম' মনে করিয়া যেমন অগ্রাহ্য করিল, পণ্ডিত, জ্ঞানী ও দূরদর্শী ব্যক্তিগণ তেমনি তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং ভবিষ্যতে এই বালক যে একজন

মস্তলোক হইবে—তাহা স্থির বুঝিয়া তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে শিশুর বয়স যখন দুই-আড়াই বৎসর হইল, তখন তিনি বিস্তর বিজ্ঞ, জ্ঞানী ও দূরদর্শী পণ্ডিতের অত্যন্ত প্রিয়—চক্ষের মণির মত হইয়া উঠিলেন। সেই সময়ে ঠাকুরদাদা রামকমল সেন মহাশয় এক দিন অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত সকলের সাম্‌নে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে,—"এই শিশু আমার বংশের গৌরব, ইহার জন্মে আমার কুল উজ্জ্বল ও বংশ পবিত্র এবং ধন্য হইয়াছে। এ বালক আমার গদিতে বসিবার সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত হইবে।"

তেমন শিশুর গৌরবে, বাপ-মা, ঠাকুরদাদা এবং আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণের বুক যেন আনন্দে ফুলিয়া উঠিল। সকলেই পরম আনন্দিত মনে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। শিশুর মঙ্গলের জন্য সেন মহাশয়ের বাটীতে নিত্য হরিসংকীর্ত্তন এবং অন্যান্য নানাপ্রকার ধর্ম্মকার্য্য সকল হইতে লাগিল। কেশবচন্দ্রও দিন দিন বড় হইতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কেশবচন্দ্রের চরিত্রে আর একটা নূতন ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল—সেটা আধিপত্যের। সকলের উপরে যাইব, সকলে অধীন হইয়া আমার কথা মত চলিবে, আমাকে ভয় করিবে, যেমন ইচ্ছা—সকলকে কথায় উঠাইব-বসাইব—এমনি একটা স্বাধীন ভাবে কর্ত্তৃত্ব করিবার ইচ্ছা শিশুর হৃদয়ে নিতান্ত প্রবল হইয়া উঠিল। সেই ইচ্ছাশক্তিই ভবিষ্যতে তাঁহাকে বিশ্ববিখ্যাত করিয়া দিল।

সাধারণতঃ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিশুগণ অবলম্বন খুঁজে, কাহারও না কাহারও উপরে নির্ভর করিয়া থাকিতে চাহে। এমন কি মায়ের কোল ছাড়িয়া বাটীর বাহিরে যাইতে হইলেও সঙ্গে একজন লোকের দরকার হয়। অধিকবয়স্ক যে কেহ একজন ভিন্ন—নিতান্ত একাকী সম্পূর্ণরূপে আপনার উপর নির্ভর করিয়া কোন কিছু করিতে সাহস পায় না। তাই তাহাদের প্রতিপালন করিবার জন্য সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক রাখা আবশ্যক হয়। কিন্তু বালক কেশবচন্দ্রের চরিত্রে সে ভাব মোটেই রহিল না, বরং তাহার বিপরীত ভাবই প্রকাশ পাইতে লাগিল।

হঠাৎ কোথাও একটা কিছু শব্দ হইলে শিশুগণ ভয়ে যখন মায়ের বুকে মুখ লুকায়, কেশবচন্দ্র তখন তাহার কারণ জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন, কেহ ধমক দিলে সকলে যখন ভয়ে কাঁদিয়া ফেলে তিনি তখন চোখমুখ ঘুরাইয়া রুখিয়া উঠেন, 'জুজুর' ভয় দেখাইয়া মা যখন ছেলেকে শান্ত করিবার চেষ্টা পান—তিনি তখন, "জুজু" কেমন—দেখিবার জন্য লাফাইয়া উঠেন। ভয়-ডর কাহাকে বলে—শিশু তাহা জানে না।

ছেলেকে বাহিরে বেড়াইতে লইয়া যাইবার জন্য মাতা যখন ঝি-চাকরকে আদেশ করিতেছেন—কেশবচন্দ্র ততক্ষণে আপনিই বাহিরে গিয়া উপস্থিত; কোন কিছু দেখাইতে লইয়া যাইবার জন্য লোকজনকে বলিতেছেন—তিনি ততক্ষণে আপনিই বুক ফুলাইয়া চলিলেন; কোন কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার জন্য ভয় দেখাইতেছেন—শিশু সেই 'ভয়' জিনিষটাকে দেখিবার জন্য অস্থির! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার পরিচারকেরা জ্বালাতন হইয়া কহিত—"বাপ্ কি ডাকাবুকো ছেলে গো, একটু ভয়-ডর নেই? এ ছেলে বড় হলে দস্যি হবে।"

এইরূপ সাহস শৈশব হইতে বয়সের সঙ্গে দিন দিন বাড়িতে

বাড়িতে কেশবচন্দ্রকে আত্মনির্ভর এবং অন্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার শক্তি দান করিতে লাগিল। ক্রমে চার পাঁচ বছরে পড়িতে না পড়িতে মায়ের কোল ছাড়িয়া তিনি যেন একজন গম্ভীর বয়স্ক লোক হইয়া দাঁড়াইলেন। দোলা ছাড়িয়া খেলার বয়স উপস্থিত হইল।

বালকদের স্বভাব যে, একাকী খেলাধূলা করিতে চাহে না—সঙ্গী খুঁজে। যতই অপরিচিত হউক না কেন—সমবয়সী দেখিলেই ছুটিয়া গিয়া ভাব করিয়া লয়। কেশবচন্দ্র সেই বয়স হইতেই খেলার দল খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন।

পাড়ায় কোন বড় মানুষের বাড়ী থাকিলে, নিকটবর্ত্তী সকল বাড়ীর ছেলেরাই সেই বাড়ীর ছেলেদের কাছে আসিয়া জুটে। সেন মহাশয়েরা সেই পল্লীর বর্দ্ধিষ্ণু লোক—বাড়ীতে সর্ব্বদাই ক্রিয়া-কলাপ লাগিয়া আছে, পাড়ার সকলেই সেখানে আসিয়া জুটে—সুতরাং বালকেরা ত আসিবেই। ইহাতে কেশবচন্দ্রের ভারি সুবিধা হইল—আপন বাড়ীতেই খেলিবার সঙ্গীর দল পাইলেন।

তখন তাঁহার সেই মনের ভাব—সকলের উপরে কর্ত্তা হইয়া নিজের ক্ষমতা চালাইবার চেষ্টা ফুটিয়া উঠিল। প্রবলের কাছে দুর্ব্বল চিরকালই হার মানে—ইহা প্রকৃতির নিয়ম। বালক কেশবচন্দ্রের প্রবল ইচ্ছা-শক্তির কাছে অন্যান্য সকল বালকেরাই মাথা নীচু করিল, সকলেই তাঁহার বশীভূত হইয়া তাঁহার ইচ্ছা ও আদেশ মত চলিতে লাগিল।

তিনি যে খেলা খেলিতে বলেন—সেই খেলা সকলেই খেলে, তিনি যাহাকে যে ভাবে যেখানে থাকিতে হুকুম করেন—সে সেইভাবে সেইখানেই থাকে, কোন কিছুর মীমাংসা করিতে হইলে, সকলেই তাঁহার উপর নির্ভর করে—তিনি যেরূপ বিচার করিয়া দেন, সকলেই মাথা পাতিয়া তাহা স্বীকার করিয়া লয়। এইরূপে সেই বাল্যকাল হইতেই কেশবচন্দ্র সঙ্গীদের সকলের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু তা বলিয়া বালক যে দুষ্টবুদ্ধিতে পাকিয়া উঠিতে লাগিল তাহা নহে, বরং অন্য রকম ভাব দেখা গেল। দলের কর্ত্তা হইয়া তিনি সকলকে লইয়া বয়স্ক লোকদের অনুকরণে সেই রকম সব খেলা খেলিতে লাগিলেন। বাড়ীতে সংকীর্ত্তন হয়, তাহা দেখিয়া শুনিয়া—তিনিও দলবল লইয়া চন্দনের ফোঁটা কাটিয়া 'হরি হরি' বলিয়া নাচিতে থাকেন—দলের সকলে তাঁহার আদেশে সেই রকম করে। অতিথিসৎকার ও অন্য সকল ক্রিয়া-কলাপ দেখিয়া—সকলকে লইয়া তিনিও সেই রকম করিতে থাকেন। আকাশের নক্ষত্র দেখিয়া—সেগুলি কি—বিচার করিতে বসেন। বাগানে ফুল ফুটে—ঠাকুর দেবতার জন্য—অন্য কারণে ফুল তুলিয়া নষ্ট করিলে তিনি অমনি—সেটা পাপের কায—তাহা বুঝাইতে থাকেন। পশুপক্ষীকে তাড়না করা অন্যায়—তাহা দৃঢ়রূপে মানা করিয়া দেন। বাপ-মার কথা না শুনিলে নরকে যাইতে হয়—তাহা বুঝাইবার জন্য বক্তৃতা জুড়িয়া দেন। এই রকমে, সদালাপ, সৎশিক্ষা, সদাচরণ প্রভৃতির খেলায় বালক কেশবচন্দ্রের দল—বাল্যখেলার মধ্যেই—কর্ত্তার অনুকরণে আপনাদের ভবিষ্যৎ চরিত্র গড়িয়া তুলিতে আরম্ভ করিল।

সাধারণ বালকদের দল যেরূপ, কেশবচন্দ্রের দল তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি নিজে গম্ভীরপ্রকৃতি—ভাবুক—সাহসী এবং পিতামাতা গুরুজনের অনুগত, সুতরাং নিজের মনের মত সঙ্গীদের গড়িয়া লইয়া সেই দলের কর্ত্তা হইবার দরুণ তাঁহার সময় এবং চরিত্র নষ্ট না হইয়া বরং দিন দিন আরও উন্নত হইতে লাগিল। এই জন্য তাঁহার দলের সঙ্গী বালকেরাও তাঁহার মত—দিন দিন ভালছেলে হইতে লাগিল। সেই একরত্তি অল্পবয়সেই কেশবচন্দ্রকে এইরূপে বাল্যক্রীড়ায় দলের কর্ত্তৃত্ব করিতে দেখিয়া বৃদ্ধ রামকমল সেন মহাশয় যেন দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন যে—কেশবচন্দ্র কালে একজন মহাপুরুষ হইবেন।

সুতরাং তাঁহারা বালকের স্বাধীন মনোবৃত্তির উপর বাধা না দিয়া—তাহাকে আরো উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বাল্যজীবনেই কেশবচন্দ্রের ভবিষ্যৎ-জীবনের অঙ্কুর দেখা দিয়া, দিন দিন পুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার বিদ্যা-শিক্ষার সময় উপস্থিত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কলিকাতার যেখানে "এ্যালবার্ট হল"—সেই সময়ে সেইখানে একটি ছোটরকমের পাঠশালা ছিল। পাঠশালাটি ছোটরকমের হইলেও—অনেক ভাল ভাল ঘরের ছোট ছোট ছেলেরা সেখানে পড়িত। সেই পাঠশালায়ই সর্ব্বপ্রথম কেশবচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হইল।

পাঠশালার ছেলেরা সব ছোট ছোট—সকলেই প্রথম বাঙ্গালা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, কাযেই, ছেলেদের গোলমালে পাঠশালা-গৃহে যেন একটা হাট বসিয়া যাইত, আর গুরু-মহাশয় মাঝে মাঝে লম্বা বেত নাড়াইয়া মুখে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া তাহাদিগকে শাসনে রাখিতেন। সেই দৃষ্টান্ত দেখিয়া কেশবচন্দ্রের মনে—সেখানকার সকলের উপরেও আধিপত্য চালাইবার ইচ্ছা হইল।

সেই ইচ্ছাশক্তি বাল্যকাল হইতেই এত প্রবল যে একবার ইচ্ছা হইলেই তিনি আর সে কায না করিয়া কিছুতেই ছাড়িতেন না, সুতরাং নিজে নানা উপায়ে শীঘ্রই সে ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে সেখানকার সকল বালকেরাই তাঁহার নিতান্ত অনুগত হইয়া পড়িল—কেশবচন্দ্র 'সর্দ্দার-পড়ো' হইয়া তাহাদের উপরে ক্ষমতা চালাইতে লাগিলেন।

এই 'সর্দ্দার-পড়ো' হইবার জন্য সেই সময়ে তাঁহাকে একটা বিষয়ে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইল। সংসারের এই নিয়ম যে আপনার চেয়ে বড় না ভাবিলে সহজে কেহ কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতে চাহে না। কেশবচন্দ্র তাহা বুঝিতেন—সুতরাং যাহাতে সকলের চেয়ে বড় হইতে পারেন, সেই আশায়—এমন মনোযোগ দিয়া পড়াশুনা করিতে লাগিলেন যে শীঘ্রই সকলকে হারাইয়া উপরে উঠিলেন। তখন গুরুমহাশয় তাঁহাকে 'সর্দ্দার-পড়ো' করিয়া দিলেন—সহজেই তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল।

কিন্তু সেখানে অধিকদিন তাঁহার লেখাপড়া চলিল না। সেই পাঠশালায় কেবলমাত্র বাংলা ভিন্ন অন্য কিছু শিক্ষা দেওয়া হইত না। ইংরাজী পড়িতে হইলে 'হিন্দুকালেজে,' কিম্বা 'হিন্দু মেট্রোপলিটান স্কুলে' পড়িতে হইত। সে সময়ে কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষার নূতন প্রথা পড়িয়া গিয়াছিল, সুতরাং সেইজন্য তাঁহাকে হিন্দুকালেজে গিয়া ভর্ত্তি হইতে হইল। সেই হইতে কেশবচন্দ্রের পাঠশালার পড়া ফুরাইল—তিনি হিন্দুকালেজে পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

হিন্দুকালেজে তিনি যে শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন, সেখানে অধিকাংশ ছাত্র সমবয়সী হইলেও, তাঁহার অপেক্ষা অধিক বয়সেরও বিস্তর ছাত্র ছিল। কিন্তু তা হইলে হইবে কি—সেখানেও সকলের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি প্রাণপণে মনোযোগ দিয়া পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঐকান্তিক চেষ্টা থাকিলে, পরিশ্রম করিবার শক্তিও আপনা আপনি বাড়িয়া যায়। আবার চেষ্টা ও পরিশ্রমের ক্ষমতা থাকিলে মনোযোগ আসে, মনোযোগ আসিলে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। সুতরাং সকলের উপরে যাইব—এই প্রবল ইচ্ছাবলে কেশবচন্দ্রের মনে যে চেষ্টা

জন্মিল, তাহাতে তাঁহার পরিশ্রমের শক্তি, মনোযোগ, স্মরণশক্তি, অধ্যবসায় প্রভৃতি এত বাড়াইয়া দিল, যে হিন্দু কালেজে ভর্ত্তি হইয়া অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি পড়াশুনায় চমৎকার কৃতিত্ব দেখাইয়া অন্য সকল ছাত্রকে নিজের বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। তাহার উপর আর একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা—সকলকে বাধ্য করিবার পক্ষে তাঁহার বিশেষ সহায়তা করিল। সেটা—অন্যের সৎকার্য্যের অনুকরণ করিবার ক্ষমতা।

ব্লটিং কাগজে যেমন কালি শুষিয়া লয় কেশবচন্দ্র তেমনি অন্যের যে কোন নূতন বা আশ্চর্য্য গুণ দেখিতেন, তখনই তাহা আয়ত্ত করিয়া লইতেন। তখনকার দিনে প্রায়ই যেখানে সেখানে বাঁশবাজী, ভোজ-বাজী প্রভৃতি তামাসা দেখাইয়া লোকে অর্থ উপার্জ্জন করিত। কেশবচন্দ্র সেই সব দেখিয়া আসিয়া শিখিয়া ফেলিতেন এবং বাড়ীতে নিজে সেই রকম সব তামাসা দেখাইয়া সকলকে অবাক্ করিয়া দিতেন। কেশব-চন্দ্রের আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া সঙ্গী বালকেরা সকলেই আপন ইচ্ছায় তাঁহার বশীভূত হইয়া যাইত।

এইরূপে যতই দিন কাটিয়া তিনি বড় হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার সেই ক্ষমতা বাড়িয়া—সংসারে সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার সাধ—তাঁহার মনে প্রবল করিয়া তুলিল। কিন্তু এই সকল বিষয়ে আশ্চর্য্য শক্তি থাকিলেও, কেশবচন্দ্র স্কুলে একটা বিষয়ে হারিয়া গেলেন—সেটা অঙ্ক শাস্ত্র। অঙ্কে তিনি মোটেই মাথা খাটাইতে চাহিতেন না—ভাবিতেন, সে সময়টা সাহিত্য প্রভৃতি চর্চ্চায় কাটাইলে বেশী শিখিতে পারিবেন। সুতরাং তিনি ভালরকম অঙ্ক শিখিলেন না।

এইরূপে হিন্দুকালেজে "সিনিয়ার স্কলারসিপের" দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া তিনি হিন্দুকালেজ ছাড়িয়া দিলেন এবং "হিন্দু মেট্রো-পলিটান" স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হিন্দু মেট্রোপলিটান কালেজ বেশী দিন ছিল না—কয়েক বৎসরের মধ্যেই উঠিয়া গিয়াছিল। যতদিন ছিল—ততদিন কেশবচন্দ্র সেই খানেই পড়িলেন। তারপরে সে বিদ্যালয় উঠিয়া গেলে—প্রেসিডেন্সী কালেজে ভর্ত্তি হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

কিন্তু প্রথম হইতেই অঙ্কের উপর অশ্রদ্ধা থাকায় তিনি গণিত শাস্ত্রে অত্যন্ত কাঁচা রহিলেন—সুতরাং বিদ্যালয়ে লেখাপড়ায় তেমন যশ লাভ করিতে পারিলেন না, কিন্তু অন্যদিকে তেমনি সেটা সুদে আসলে পোষাইয়া লইলেন। বিদ্যালয়ে পাঠের সময় হইতেই সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত সময়, চেষ্টা ও মনোযোগ অর্পণ করিলেন। সুতরাং অন্য ছেলেদের কাছে যেমন একমাত্র অঙ্ক-শাস্ত্রে হারিয়া গেলেন, তেমনি আর সকল শাস্ত্রেই তাহাদের উপরে ছাড়াইয়া উঠিলেন।

কায়মনোপ্রাণে যে বিষয়ের চর্চ্চা করা যায়, মানুষ সেই বিষয়েই উত্তমরূপ শিক্ষিত হইয়া উঠে। কেশবচন্দ্র অতি অল্পকাল মধ্যে দেখিতে দেখিতে ইংরাজী সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতিতে পরম অভিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। সেক্‌স্‌পিয়ার, মিলটন প্রভৃতি বড় বড় কবির কাব্যসকল যেমন আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন, ‘বেকন’ প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতের লেখাসকলও তেমনি আয়ত্ত করিয়া প্রচুর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য লাভ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বিদ্বান্ হইবার আকাঙ্ক্ষা ও জ্ঞানলাভের তৃষ্ণা এত বাড়িল যে তিনি খেলা, বিশ্রাম ও ভ্রমণ ছাড়িয়া দিবারাত্রি কেবল সেই সকল পুস্তকের মধ্যে মগ্ন হইয়া রহিলেন। এইরূপ ঐকান্তিক চেষ্টা, মনোযোগ, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে—কালেজে পড়িবার সময় হইতেই মহাজ্ঞানী হইয়া উঠিলেন।

ছেলেবেলা হইতেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং উন্নত হইবার আশা যে বালকের মনে প্রবল থাকে সে কখনো চঞ্চলমতি হইতে পারে না। কেশবচন্দ্রের মনে—সকলের চেয়ে বড় হইবার একটা প্রবল উচ্চ আকাঙ্ক্ষা—বাল্যকাল হইতেই জাগিয়াছিল, সেইজন্য শৈশব হইতেই তিনি গম্ভীর-প্রকৃতি ছিলেন; সেই প্রকৃতির বশে চলিয়াই তিনি দলের সর্দ্দার হইতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মনে নীচতা কিম্বা প্রবৃত্তিতে হীনতার ছায়া পর্য্যন্ত লাগিতে পারিল না। দিন দিন কিসে অধিকতর বড় হইবেন—কিসে সকলের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিয়া যাইতে পারিবেন—সেই চেষ্টায় তাঁহার স্বভাবও দিন দিন উচ্চ হইতে উচ্চ-তর হইতে লাগিল। সুতরাং হীনবৃত্তি সকল তাঁহার কাছ হইতে দূরে পলাইল।

কিন্তু কালেজে পড়াশুনা করা আর বেশী দিন চলিল না। প্রথমতঃ অঙ্কশাস্ত্রে কাঁচা বলিয়া সেখানকার পড়ায় উন্নতির আশা নাই, দ্বিতীয়তঃ তিনি এতই কাহিল—শরীর এত দুর্ব্বল যে সেইরকম পড়ার গুরুতর পরিশ্রম তাঁহার সহিল না, স্বাস্থ্যভঙ্গের সম্ভাবনা দেখা দিল। তখন তিনি বাধ্য হইয়াই কালেজ ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু সাধারণ বালকদের মত স্কুল-কালেজ ছাড়িয়া তিনি নামকাটা সেপাই হইলেন না।

তখন তাঁহার যৌবনের প্রারম্ভ—রূপ-শ্রীতে চেহারা সুন্দর হইয়া ঝল্-মল্ করিতেছে। তাহাতে বড়লোকের ছেলে—পয়সার অভাব নাই। এইসব গুলি একত্র মিলিলে অধিকাংশ ছেলেরাই উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র, কুৎসিত আমোদ-প্রমোদ-প্রিয়, বিলাসী এবং কু-নীতি-পরায়ণ হইয়া উঠে। কিন্তু কেশবচন্দ্রের চরিত্রে তাহার কিছুই প্রকাশ পাইল না—বরং বিপরীত লক্ষণ সকলই দেখা যাইতে লাগিল। উচ্ছৃঙ্খল না হইয়া তিনি অধিকতর মিতাচারী হইলেন, দুর্নীতি এবং দুষ্ক্রিয়া সকলের উপর বিষম ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মিল, ন্যায় ও ধর্ম্ম-নীতির নিতান্ত পক্ষপাতী

হইয়া আপন জীবনে পদে পদে তাহার অনুকরণ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন।

তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রথম অঙ্কুর এই সময় হইতেই ফুটিয়া উঠিল। বাল্যকালে যে বালক হরিনামে গলিয়া যাইত, সংকীর্ত্তনে মাতিয়া উঠিত, সঙ্গিগণকে লইয়া ফোঁটা কাটিয়া নিজেরা নাম-কীর্ত্তন করিত, বয়সের সহিত সেই ভাব—সেই স্পৃহা প্রবল হইয়া দিন দিন যে সে বালককে ধর্ম্মপথে টানিয়া লইয়া যাইবে—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

ছেলেদের কোন কিছুর দরকার হইলে যেমন মায়ের কাছে চায়, দুঃখ হইলে যেমন তাঁহাকে জানায়, বিপদে পড়িলে যেমন তাঁহাকে ডাকে, তেমনি হরি-সংকীর্ত্তনের মধ্যে একটা ডাকের আকুলতা—স্নেহের আবদার ও দুঃখের নিবেদন রহিয়াছে টের পাইয়া কেশবচন্দ্র বুঝিলেন যে সন্তান চাহিলেই মা-বাপ যেমন তাহাকে সেই বস্তু দিয়া থাকেন, তেমনি মানবগণ চাহিলেই জগৎপিতা ও জগজ্জননী তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন—নহিলে কীর্ত্তনের মধ্যে এত ডাকাডাকির ধূম পড়িবে কেন? সুতরাং ঈশ্বরের কাছে সকল জিনিষ চাহিয়া লইতে হয়। অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিতে হয়—দুঃখের কথা জানাইতে হয়—অভাব জানাইয়া তাহা পূরাইবার জন্য—প্রার্থনা করিয়া ডাকিতে হয়। সেই হইতে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার ভাব ও ইচ্ছা তাঁহার মনে প্রথম জাগিল।

তাহার উপর তিনি দেখিলেন যে খৃষ্টানেরা "ও লর্ড" অর্থাৎ "হে প্রভু" বলিয়া প্রার্থনা করে, মুসলমানেরা সকলে মিলিয়া একত্রে নমাজের সময়ে সমবেত উচ্চকণ্ঠে এমন কিছু বলে—যাহা আকুল হৃদয়ের কাতর প্রার্থনা ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহার মনেও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল এবং ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে "হে বিভু" বলিয়া তিনিও প্রার্থনা করিবেন।

যখন নিজের মনে এ বিষয় ঠিক হইল তখন নিজে সেই রকমে "বিভু হে" বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। লোকে শুনিয়া কেহ হাসিল, কেহ বা ছেলেমানুষ ভাবিয়া উড়াইয়া দিল। কিন্তু কেশবচন্দ্র তাহাতে দৃক্‌পাত করিলেন না, তিনি আপনার দলের মধ্যে যাহাতে সেইরকম প্রার্থনা-করা চালাইতে পারেন তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এ চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল হইল না। তাঁহার দেখা-দেখি তাঁহার অনুগত বালকেরাও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা আরম্ভ করিয়া দিল।

ইহা দেখিয়া কেশবচন্দ্রের উৎসাহ বাড়িল, ইচ্ছা হইল—সকলে মিলিয়া এক জায়গায় জমিয়া মহাসমারোহে যেমন হরি-সংকীর্ত্তনে মাতিয়া উঠে—তেমনি দেশের সকলকে একত্রে মিলিত করিয়া সমবেত প্রার্থনায় সকলকে মাতাইবেন। ধর্ম্মের আলোকে সকলকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবেন। তখন আর শুধু সেই ছেলের দল লইয়া থাকিতে প্রাণ চাহিল না। কিন্তু ইহাতে একটা বাধা।

তাঁহার মনের ভাব সকলকে বুঝাইতে না পারিলে, সকলের হৃদয়ে আধিপত্য করিতে পারিবেন কেন? সকলকে তাঁহার মনের ভাব—প্রাণের কথা বুঝাইতে হইবে, তবে তাহারা তাঁহার বশ হইয়া কথামত চলিবে। কিন্তু সকলে তো লেখাপড়া জানে না,—তাঁহার মনের ভাব বুঝিবে কেমন করিয়া? তিনি যদি কোন মতে সহজে সকলের লেখাপড়া শিখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের ও সমাজের যথার্থ মঙ্গল করা হইবে এবং নিজেরও উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে।

এইরূপ ভাবিয়া কেশবচন্দ্র ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে কলুটোলায় সর্ব্ব-প্রথম এক নৈশ-বিদ্যালয় (Night School) স্থাপন করিলেন এবং সেখানে সমবয়সী বন্ধুবান্ধবগণকে লইয়া, পাড়ার দরিদ্র বালক এবং ছোট বড়, ইতর ভদ্র সকল শ্রেণীর শ্রমজীবিগণকে লেখাপড়া, নীতি ও

ধর্ম্মসম্বন্ধে শিক্ষা ও উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই যৌবনের প্রারম্ভেই কেশবচন্দ্রের ভবিষ্যৎ মহৎ জীবনের ছায়া ফুটিয়া উঠিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঈশ্বরের এমনই দয়া—তাঁহার নামের এমনি প্রভাব যে—খেলাচ্ছলে কিম্বা যে কোন ভাবে হউক—যে কেহ তাঁহার নাম লইয়া একবার নাড়াচাড়া করে, সে-ই কালে তাহাতে ডুবিয়া আপনা হইতেই মগ্ন হইয়া যায়। কেশবচন্দ্র ক্ষুদ্রদলের অধিপতি হইয়া তাহাদিগকে লেখাপড়া নীতি ধর্ম্ম ও প্রার্থনা শিক্ষা দিতে গিয়া আপনি তাহার ভিতরে ডুবিয়া গেলেন। দিনরাত্রি কেবল ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও ধর্ম্ম-চিন্তাতে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। নিজের মনে ভগবানের যেরূপ প্রার্থনা করা উপযুক্ত স্থির করিয়াছিলেন, নিজে অনবরত সেইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে ভগবানের অশেষ কৃপা লাভ করিয়া ধর্ম্মজগতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

তখন হইতে তাঁহার স্বভাবেও একটু পরিবর্ত্তন দেখা দিল। তিনি আর সর্ব্বদা কাহারও সঙ্গে বড় একটা মেশামিশি করিতে চাহেন না—কাহারও সঙ্গে বৃথা হাস্য-পরিহাস ও গল্প-গুজবে কাটাইতে চাহেন না—এমন কি নিজের দলের অধীনস্থ সঙ্গিগণ হইতেও সর্ব্বদাই যেন একটু ফাঁকে ফাঁকে—তফাতে তফাতে থাকিতে চান—কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে না হইলে যেন বাঁচিয়া যান। দিনরাত্রি একা একা থাকিতে চেষ্টা করেন—একা একা ভাবনার সাগরে ভাসিতে থাকেন। তিনি স্বভাবতঃই গম্ভীর-প্রকৃতি—হঠাৎ মুখের উপরে কেহ কিছু বলিতে সাহস করিত না, তার উপরে আবার এইরকম ভাব হওয়ায় কেহ আর

তাঁর কাছে ঘেঁসিতে সাহস করিল না। সকলেই ভাবিল যে বড়মানুষের ছেলে বলিয়া তিনি অহঙ্কারী এবং আত্মাভিমানী হইয়া উঠিতেছেন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব নিরাকরণ করিবার জন্য তাঁহার মন আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি দেখিলেন যে চারিদিকে নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়—সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন মত—ভিন্ন ভিন্ন পথ। কোন্ মতে কোন্ পথে চলিলে তিনি আসল বস্তু সহজে খুঁজিয়া পাইবেন সেই চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-মত জানিবার ও বুঝিবার জন্য মুসলমান, খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি সকল দলে মিশিতে লাগিলেন।

তখনকার দিনে পাদ্রী সাহেবেরা ধর্ম্মের উপদেশ ও বক্তৃতায় দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছিলেন। অনেক ভাল ও বড় ঘরের তরুণবয়স্ক বালকেরা তাঁহাদের কথায় মোহিত হইয়া খৃষ্টান হইতেছিলেন, সুতরাং হিন্দুসমাজের ভিতরে একটা অত্যন্ত ভয়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সকলেই আপন-আপন পুত্রগণকে সামলাইতেছিলেন। সেই সময়ে কেশবচন্দ্র পাদ্রী 'ব্যারণ' সাহেবের কাছে বাইবেল পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং এমন কি তাঁহাদের অনুকরণে "ও লর্ড" বলিয়া মাঝে মাঝে চক্ষু বুজিয়া ইংরাজীতে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার দলের মধ্যে একটা ভারি হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। তিনি খৃষ্টান হইয়াছেন ভাবিয়া অনেকে ঘৃণা করিল—অনেকে রহস্য করিল—অনেকে নানা রকমে তীব্র উপহাস করিতে লাগিল। কেশবচন্দ্র সে সকল দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া আপন মনে নিজের কর্ত্তব্য সাধন করিতে লাগিলেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার বাটীতেও অত্যন্ত গোলযোগ আরম্ভ হইল। তিনি বৈষ্ণবের পুত্র—বৈষ্ণবের ঘরে জন্মিয়াছেন—বৈষ্ণবের ভাবে শিক্ষিত হইয়াছেন। সেই বৈষ্ণবের গৃহে বৈষ্ণবের মধ্যে থাকিয়া পাদ্রী সাহেবের কাছে বাইবেল পড়া এবং তাঁহাদের অনুকরণে ইংরাজীতে প্রার্থনা করা—তাঁহার পরিবারবর্গের সকলেরই

অত্যন্ত আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিল। বিশেষ সেই সময়ে অনেক যুবক খৃষ্টান হইয়াছিলেন এবং হইতেছিলেন। পাছে তিনিও খৃষ্টান হইয়া যান এই ভয়ে বাড়ীর সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং শীঘ্রই তাঁহার বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করিলেন।

'বালী' গ্রামে একঘর খুব সম্ভ্রান্ত বৈদ্যের বাস ছিল—ধনে মানে তাঁহারা কলুটোলার সেনবংশের অপেক্ষা হীন ছিলেন না। সেই ঘরে কেশবচন্দ্রের বিবাহের কথা স্থির হইল এবং ইংরাজী ১৮৫৬ সালের ২৭শে এপ্রেল তারিখে সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত গোলাপসুন্দরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। এই বিবাহে এত ধূমধাম ও সমারোহ হইল যে লোকে অনেক দিন পর্য্যন্ত কেশবচন্দ্রের বিবাহের কথা ভুলিল না।

কিন্তু এই বিবাহের পর হইতে কেশবচন্দ্রের স্বভাবের পরিবর্ত্তন না হইয়া পূর্ব্বভাব বরং আরও বাড়িয়া গেল—তিনি অত্যন্ত নির্জ্জনতা-প্রিয় হইয়া উঠিলেন। বিশেষ চেষ্টা করিয়া সর্ব্বদাই নিতান্ত একাকী থাকিতে লাগিলেন; লোকজন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় কথাবার্ত্তা একরকম বন্ধ করিলেন বলিলেই হয়, এমন কি পত্নীর সহিত পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা ও সাক্ষাৎ প্রায় রহিত হইয়া গেল। সর্ব্বদাই লোকের কাছ হইতে একাকী আপনমনে দূরে দূরে সরিয়া থাকিতে লাগিলেন, লোকের সহিত শিষ্টাচার প্রায় ভুলিয়া গেলেন, এমন কি কোন অপরিচিত ব্যক্তি আলাপ করিতে আসিলে তাহার সঙ্গেও ভালরকম কথাবার্ত্তা কহিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এই সব কারণে সকলেই বলিতে লাগিল যে তিনি ঘোরতর অহঙ্কারী হইয়া উঠিয়াছেন—সুতরাং সকলেই তাঁহার কাছ হইতে তফাতে থাকিতে লাগিল।

ইহাতে কেশবচন্দ্রের পক্ষে সুবিধাই হইল, তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া কায়মনোপ্রাণে ধর্ম্মচর্চ্চায় রত হইলেন। বাইবেল প্রভৃতি পাঠ করিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিল যে—ঈশ্বর নিরাকার। হিন্দুরা যে

মূর্ত্তি গড়িয়া সাকার পরমেশ্বরের পূজা করেন তাহা নিতান্ত ভুল বলিয়া তাঁহার জ্ঞান জন্মিল।

কিন্তু তা বলিয়া তিনি হিন্দুধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ এবং উচ্চ নীতি ভুলিলেন না বা সেই ধর্ম্মকে ঘৃণা করিলেন না। বরং অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে ভাল ভাল জিনিষগুলি লইয়া হিন্দুধর্ম্মের ভাল ভাল জিনিষের সঙ্গে মিশাইয়া এক উচ্চ আদর্শ ধর্ম্মমতের সৃষ্টি করিলেন। দুধে জল মিশাইয়া দিলে হাঁস যেমন সেই জলের ভিতর হইতে দুধটুকু ছাঁকিয়া লয়, তিনিও সেইরকম সকল ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের ভ্রমপূর্ণ নিন্দনীয় অংশগুলি ত্যাগ করিয়া ভাল ভাল মতগুলি বাছিয়া একত্র করিলেন, এবং সমস্ত অভ্রান্ত, সত্য, উচ্চ মতগুলি হিন্দুধর্ম্মের সহিত মিলাইয়া একত্রিত করিয়া সেই আদর্শ-ধর্ম্মপথে চলিতে আরম্ভ করিলেন। সুতরাং বাইবেল পড়িয়া—পাদ্রীদের সঙ্গে মিশিয়াও তিনি খৃষ্টান হইলেন না, বা হিন্দুধর্ম্ম ছাড়িলেন না—বরং স্বদেশীয় উৎকৃষ্ট ভাবে, আচারে, ব্যবহারে, পরিচ্ছদে তিনি সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী থাকিয়া হিন্দুধর্ম্মের সত্যপথে চলিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে কি প্রকারে তিনি দেশের লোককে আপনার মতে চালাইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ছোট ছোট বিস্তর কাগজে নিজের হস্তে লিখিলেন—"হে পথভ্রান্ত পথিকগণ! সংসারে আসিয়া সত্য-পথ ভুলিও না, তোমরা কি ভাবিতেছ? এ সংসারে শান্তি নাই—সর্ব্বদা মৃত্যুকে স্মরণ কর।"

এইরূপ লিখিয়া গোপনে সেইকাগজগুলি পথের ধারে দেয়া-লের গায়ে আঠা দিয়া আঁটিয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার প্রথম ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ হইল। লোকেরা তাহা পড়িয়া ভাবিল যে—হয়তো কোন পাদ্রী সাহেব এইরূপ করিতেছে, কিন্তু তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যাহারা টের পাইল, তাহারা তাঁহাকে অত্যন্ত বিদ্রূপ করিতে লাগিল, তবুও তিনি কিছুতেই টলিলেন না।

সেই সময়ে কলুটোলায় নিজের বাড়ীতে তিনি "গুড্ উইল ফ্রেটার্‌নিটি" নাম দিয়া ধর্ম্ম আলোচনা করিবার জন্য একটি সভা স্থাপন করিলেন, সেই সভা হইতেই তিনি সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্যভাবে বক্তৃতা ও প্রার্থনা করা শিখিলেন। তারপরে হিন্দুকালেজের থিয়েটারের গৃহে "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি" নামে একটি সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চ্চার সভা স্থাপিত হইল। এই সভায় যোগ দিয়া তিনি তাঁহার ভুবন-বিজয়ী বক্তৃতার শক্তি সঞ্চয় পূর্ব্বক, অনবরত ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়া দেশবিখ্যাত অদ্বিতীয় বক্তা হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে ঘটনাক্রমে তিনি 'রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা' নামক পুস্তক পড়িলেন—সেই পুস্তকখানি আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাহির হইয়াছিল। সেই পুস্তক পড়িয়া তিনি দেখিলেন যে তাঁহার ধর্ম্মমত এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মত—এক। সুতরাং তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইল, মন ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি আকর্ষিত হইল। তিনি সেই সময় হইতেই আদি ব্রাহ্ম-সমাজে ভর্ত্তি হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতে করিতে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের খুব প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি, স্বভাব-চরিত্র, ধর্ম্ম-মত ও বক্তৃতাশক্তির পরিচয় পাইয়া মহর্ষি প্রকৃতই তাঁহাকে ভাল বাসিলেন। মহর্ষির ভালবাসা ও অনুগ্রহ লাভ করিয়া কেশবচন্দ্র অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন এবং সমাজে যাতায়াত ঘন ঘন বাড়াইয়া তুলিলেন।

ইহাতে তাঁহার বাড়ীর লোকেরা বড় ভয় পাইল, বিশেষ তাঁহার জননীর ভয় ও উৎকণ্ঠার সীমা রহিল না। কারণ শৈশবেই কেশবচন্দ্রকে পিতৃহীন হইতে হইয়াছিল, সে অবস্থায় মায়ের মত কে আর তাঁহাকে

স্নেহের চক্ষে দেখিবে? ইতিমধ্যেই পুত্রের আচারব্যবহারে বাড়ীর লোকেরা মনে মনে তাঁহার উপর চটিয়াছিল। এক্ষণে কেশবচন্দ্র বৈষ্ণবধর্ম্ম ছাড়িয়া যদি অন্য কোন ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তা হইলে বাড়ীর কর্ত্তারা হয়ত তাঁহাকে তাড়াইয়া দিবে—হয়ত আর সে বাটীতে ঢুকিতে দিবে না, তাহা হইলে কেশবচন্দ্রের কি হইবে, এই ভয়ে জননী অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

এদিকে কেশবচন্দ্রের ভাবগতিক দেখিয়া বাড়ীর লোকেরা সকলেই তাঁহার মাতাকে পরামর্শ দিল যে—"এই বেলা কেশবচন্দ্রকে মন্ত্র দিয়া দাও, গুরুকরণ হইলে তাহার মন ঠাণ্ডা হইবে এবং ভিতরে ভিতরে অন্য কোন ধর্ম্মগ্রহণের ইচ্ছা থাকিলেও তাহা আর পারিয়া উঠিবে না।

এ যুক্তি কেশবচন্দ্রের মাতার কাছে সৎযুক্তি বলিয়াই বোধ হইল। তিনি সেই পরামর্শমত গুরুকে আহ্বান করিয়া আনাইয়া পুত্রকে মন্ত্র প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন। ক্রমে দিন স্থির হইল, বাড়ীতে সমস্ত আয়োজন হইল, গুরু আসিলেন। এখন কেশবচন্দ্রকে মন্ত্র দিলেই হয়। মাতা আশা ও আতঙ্কে ছটফট করিতে লাগিলেন।

কিন্তু মায়ের আশা পূরিল না—আতঙ্কই সার হইল। কেশবচন্দ্র কোথায় যে তাঁহাকে মন্ত্র দিবে? জোর করিয়া মন্ত্র দেওয়াইবার ব্যবস্থা দেখিয়া কেশব সে দিন আগে হইতেই এমনভাবে সরিয়া পড়িলেন যে কেহই তাহা টের পাইল না। বাড়ী ছাড়িয়া একেবারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গৃহে পলাইয়া গেলেন—এবং সমস্ত দিনের মধ্যে আর বাড়ীতে ফিরিলেন না।

চারিদিকে সারাদিন ধরিয়া লোকে ছুটাছুটি করিয়া তাঁহাকে খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু কেহই তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্ধান পাইল না। মাতা বুঝিলেন যে মন্ত্র লইবার ভয়েই কেশবচন্দ্র পলাইয়াছেন, সময় অতীত হইয়া না গেলে, দিন থাকিতে তিনি কিছুতেই ফিরিবেন না।

হইলও তাই। সমস্ত দিন কাটিল, মন্ত্র দিবার দিন ও সময় নষ্ট হইয়া গেল, সন্ধ্যাও কাটিয়া রাত্রি হইল, তবু তাঁহার দেখা নাই। শেষে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের বাড়ীতে কাটাইয়া, ব্রাহ্মসমাজের খানকতক ধর্ম্ম-পুস্তক হাতে লইয়া রাত্রি দশটার পরে কেশবচন্দ্র গৃহে ফিরিলেন এবং মাতার হস্তে সেই পুস্তক কয়খানি দিয়া কহিলেন—আমি এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, অন্য মন্ত্র লইতে পারিব না।

কেশবচন্দ্রের মাতা সেই পুস্তকগুলি গুরুর হাতে দিয়া পুত্রের মনের কথা জানাইলেন। গুরু সেই বই কয়খানি উত্তমরূপে নাড়াচাড়া করিয়া দেখিয়া শেষে কহিলেন—"এ ধর্ম্মত দেখিতেছি উত্তম,—হিন্দুধর্ম্মের সার তত্ত্ব—কিন্তু বড় কঠিন, রক্ষা করিতে পারিলে হয়!" গুরুদেবের মুখে সেই কথা শুনিয়া তিনি আর পুত্রকে তিরস্কার বা তাড়না করিলেন না। তাহাতে কেশবচন্দ্রের মনের উৎসাহ আরও বাড়িল। অবশেষে ইংরাজী ১৮৫৭ সালের শেষে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। চারিদিকে ভয়ানক একটা হৈ-হৈ পড়িয়া গেল, সকলেই তাঁহার মাতাকে দোষ দিয়া কহিল—"উনিই অতিরিক্ত আদর দিয়া কেশবকে নষ্ট করিলেন।"

এদিকে প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ করার পর কেশবচন্দ্র বাড়ীর সকলেরই বিষম চক্ষুশূল হইয়া উঠিলেন। তিরস্কার, নিন্দা, দুর্নাম তো অঙ্গের ভূষণ হইল, তাছাড়া সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতে লাগিল এবং নানা উপায়ে সর্ব্বদাই নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কথা কহে না—স্পর্শ করে না—কাছে ডাকে না—মুখ দেখিতে চাহে না, তার উপর অপমানের উপর অপমান, পীড়নের উপর পীড়ন, লাঞ্ছনার উপর লাঞ্ছনা দিতে লাগিল। তবুও তিনি টলিলেন না—দৃঢ়চিত্তে আপন ধর্ম্মপথে—আপন ধর্ম্মমতে—আপনার কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে লাগিলেন।

ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস ভক্তি ও নির্ভর করিয়া যে নিজের পায়ে

ভর দিয়া দাঁড়াইতে চাহে, ভগবান্ পদে পদে তাহাকে সাহায্য করেন। নিজের গৃহে—নিজের জাতি ও সমাজে--আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের ভিতরে সকলেই বিপক্ষ হইয়া তাঁহাকে অশেষ প্রকারে দুঃখ কষ্ট যাতনা দিতে লাগিল বটে, কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পরম বন্ধু ও অভিভাবকস্বরূপ হইয়া তাঁহাকে রক্ষা ও সাহায্য করিতে লাগিলেন। সুতরাং এ পক্ষের শত্রুতায় কেশবচন্দ্রের কিছুমাত্র ক্ষতি হইল না।

এই সময়ে কেশববাবু কতিপয় উদারচরিত্র বন্ধুবান্ধবকে লইয়া গোপাল মল্লিকের বাটীতে "বিধবা-বিবাহ" নাটক অভিনয় করিলেন। সে অভিনয় অতি সুন্দর হইল—ব্রাহ্মসমাজ ও শিক্ষিত সমাজে তাঁহার খুব সুখ্যাতি রটিল।

ইহার কিছুদিন পরে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহ, উদ্যোগ এবং সাহায্যে, ইংরাজী ১৮৫৯ সালের ২৪শে এপ্রেল তারিখে গোপাল মল্লিক মহাশয়ের বাটীতে, যুবকদিগের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্ম-বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। এই বিদ্যালয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বাংলাভাষাতে এবং কেশবচন্দ্র ইংরাজীতে যথানিয়মে ধর্ম্ম-বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এইখানে কেশববাবু যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা পরে পুস্তকা-কারে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইল।

ইহার ফলে স্কুল-কালেজের ছেলেদের মধ্যে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে অত্যন্ত আলোচনা ও আন্দোলন আরম্ভ হইল। খৃষ্টান হইবার একটা ঢেউ চলিয়াছিল, কিন্তু কেশববাবুর বক্তৃতা শুনিয়া এবং পুস্তকসকল পড়িয়া সে স্রোত মন্দ হইয়া আসিল। যাঁহারা খৃষ্টান হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাঁহারা সে সংকল্প ছাড়িলেন, অনেকে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। এমন কি যাঁহারা কি হিন্দু কি খৃষ্টান কোন ধর্ম্মেই বিশ্বাস করিতেন না—সম্পূর্ণ-রূপে নাস্তিক মত লইয়াছিলেন—তাঁহারাও সেই মত ছাড়িয়া ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেন এবং কেশববাবুর মতে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মবিদ্যালয় কিছুদিন গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে থাকিয়া, সেখান হইতে কলুটোলায় একটি বাড়ীতে উঠিয়া গেল, তারপর কেশবচন্দ্র তাহাকে উঠাইয়া লইয়া, আদি ব্রাহ্ম-সমাজের দ্বিতল বাড়ীতে আনিয়া স্থাপন করিলেন। সেইখানেই যথানিয়মে তিনি ধর্ম্ম-শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

৺রাজা রামমোহন রায় সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেও তিনি তাহা উত্তমরূপে প্রচার বা কোনরকম নিয়মে বাঁধাবাঁধি করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার সময়ে ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেখানে সপ্তাহে একটি দিন—কেবল মাত্র বুধবার ভিন্ন—উপাসনা হইত না। তখন যাঁহারা ঐ ধর্ম্ম লইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই নিজ সমাজের মধ্যে থাকিয়া, হিন্দু-ধর্ম্মের মতে সকল রকম ক্রিয়া-কলাপ বজায় রাখিয়া, তবে—সপ্তাহে একবার মাত্র—প্রতি বুধবারে আসিয়া ব্রাহ্ম-মন্দিরে উপাসনা করিতেন। এখনকার মত 'ব্রাহ্ম' বলিয়া কোন পৃথক্ সম্প্রদায় হয় নাই। তাঁহাদের কোনরকম ক্রিয়া-কলাপ বা আচার-ব্যবহারও কোন পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে হইত না। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সংস্কার করিয়া সেই সব সৃষ্টি করিলেন। 'ব্রাহ্ম' বলিয়া এখন যে এক পৃথক্ নূতন সম্প্রদায় ও পরিবার গঠিত হইয়াছে—কেশবচন্দ্রই তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা।

কেশবচন্দ্রের পূর্ব্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম-সমাজের কতকটা সংস্কার করিয়াছিলেন বটে—যাহারা 'ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম' লইবে—তাহাদের জন্য কতকগুলি বিশেষরকম পৃথক্ নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা তেমন চল্‌তি হয় নাই। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম লইয়াও লোকে নিজ নিজ

গৃহে প্রতিমা পূজায় যোগ দিত, হিন্দুদের মত ক্রিয়া-কলাপ প্রভৃতি করিত। কেশবচন্দ্র সেগুলি দূর করিয়া দিয়া 'ব্রাহ্ম'গণের জন্য একেবারে পৃথক্ সম্প্রদায়, পৃথক্ পরিবার, পৃথক্ ক্রিয়া-কলাপ, পৃথক্ আচার-ব্যবহার সৃষ্টি করিয়া প্রচারিত ও চালিত করিতে লাগিলেন। তাহার ফলেই এক্ষণে সে ধর্ম্ম এরূপ দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রথমে কেশববাবু ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের জন্য কতকগুলি কঠোর নিয়ম বাঁধিয়া দিলেন, তাহাতে ব্রহ্মচর্য্য বাড়িল। হবিষ্য বা নিরামিষ খাওয়া আরম্ভ হইল, মাদক দ্রব্য ত্যাগ হইল, এমন কি তামাক খাওয়া নিষেধ হইয়া নস্য লইবার নিয়ম হইল। ভাল জুতা ছাড়িয়া চটী জুতা এবং জামা-জোড়া ছাড়িয়া মোটা চাদর চলিল, তা ছাড়া উপাসনার ঘটা ধূম-ধামে সুরু হইল। ব্রাহ্মগণ সকলেই একরকম উদাসীন সন্ন্যাসীর মত হইয়া উঠিলেন। কেশবচন্দ্র নিজে সকল বিষয়ের আদর্শ দেখাইতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম লইলেও তিনি যে সংসার-ধর্ম্ম ছাড়িয়া এরূপ উদাসীন ভাবে কাটাইবেন ইহাতে তাঁহার বাড়ীর লোকের প্রাণে ঘা লাগিল, ভয় হইল পাছে তিনি একেবারে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া যান। বিশেষ ইহাতে তাঁহার মাতা আশঙ্কায় অত্যন্ত আকুল হইয়া উঠিলেন। তখন বাড়ীর লোকেরা ধরিয়া-করিয়া তাঁহাকে কোনরকম কর্ম্ম-কাযে লাগাইয়া দিবার চেষ্টা করিল। তাহার ফলে তাঁহার একটি চাকরি জুটিল।

ইং ১৮৫৯ সালের ১লা নবেম্বর কেশবচন্দ্র কলিকাতায় বেঙ্গল ব্যাঙ্কে ৩০৲ ত্রিশ টাকা বেতনের একটি চাকরিতে ভর্ত্তি হইলেন।

কেশবচন্দ্রের হাতের লেখা অতি সুন্দর। তাহা দেখিয়া ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার মাহিনা বাড়াইয়া ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা করিয়া দিলেন। সেই সময়ে কেশবচন্দ্র সেই চাকরিস্থলে

বসিয়া বসিয়াই একখানি পুস্তক লিখিলেন—"হে বঙ্গীয় যুবকগণ, ইহা তোমাদেরই জন্য"। এই পুস্তক পড়িয়া ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী সাহেব তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে অধিকতর স্নেহ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু কেশববাবু বেশী দিন চাকরিতে লাগিয়া থাকিতে পারিলেন না। কিসে ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশবিদেশে প্রচারিত হইয়া পড়িবে, কিসে তাঁহার সত্য-ধর্ম্ম-মত জগদ্‌বাসী শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিবে এই সব চিন্তায় যিনি অষ্ট প্রহর বিভোর, তিনি কি সে চিন্তা ছাড়িয়া সারাদিন কর্ম্মস্থলে আটক থাকিয়া কলম পিশিতে পারেন? বছর দুই আড়াই চাকরি করিয়া ইংরাজী ১৮৬১ সালের ১লা জুলাই তিনি কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেন। ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী তাঁহাকে এত ভালবাসিতেন, তাঁহার গুণে এমন মোহিত হইয়াছিলেন, যে তিনি বারম্বার কহিলেন—"তুমি চাকরি ছাড়িও না, আমি শীঘ্র তোমার একশত টাকা মাহিনা করিয়া দিব।" কিন্তু তিনি কাহারও কোন কথা গ্রাহ্য করিলেন না। চাকরি ছাড়িয়া দিলেন।

ইহাতে বাড়ীর লোকেরা আবার বিরক্ত হইলেন। তার উপর চাকরি ছাড়িয়া কেশবচন্দ্র তাঁহার 'ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম' প্রচারের জন্য যখন দিবানিশি প্রাণপাত চেষ্টা আরম্ভ করিলেন, সমস্ত কর্ম্ম-কায ছাড়িয়া কেবল সেই বিষয় লইয়াই মত্ত হইলেন এবং অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিলেন, তখন তাঁহারা মনে মনে অত্যন্ত চটিলেন।

সেই সময়ে কেশবচন্দ্রকে আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের পদে অভিষিক্ত করিবার জন্য মহর্ষি একটি শুভদিন ধার্য্য করিলেন। কেশববাবু স্থির করিলেন যে সেই শুভদিনে তিনি তাঁহার মাতা, পত্নী প্রভৃতি সকলকে মহর্ষির বাড়ীতে আনিয়া স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া উপাসনার আদর্শ স্থাপন করিবেন। তাহা ভাবিয়া তিনি পূর্ব্বরাত্রে বাড়ী গিয়া মায়ের

কাছে আপনার অভিপ্রায় জানাইলেন। মাতা পুত্রকে এত ভাল-বাসিতেন যে নিষেধ করিলে পাছে তিনি মনে কষ্ট পান সেই ভয়ে অমত করিলেন না। কেশবচন্দ্র আনন্দের সহিত সকলকে জানাইলেন যে রাত্রি পোহাইলেই তিনি মেয়েদের 'ঠাকুর'-বাড়ীতে ব্রাহ্ম-সমাজে লইয়া যাইবেন। এই কথা শুনিয়া বাড়ীর লোকেরা কিন্তু ভয়ানক চটিয়া গেল, তাঁহার উপর একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল এবং কিসে সে কার্য্যে বাধা দিবে, তাহার নানা রকম উপায় ঠাওরাইতে লাগিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া কেশবচন্দ্র মাতা, স্ত্রী প্রভৃতিকে লইয়া যেমন যাইবার জন্য বাহির হইবেন—অমনি বাধা পাইলেন। দেখিলেন বাড়ীর কর্ত্তার হুকুমমত সদর দরজা বন্ধ এবং আত্মীয় কুটুম্বগণ সকলে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া তাঁহাকে আটক করিবার চেষ্টা করিতেছে। কেশবচন্দ্র দেখিলেন এই বাধা কাটাইতে না পারিলে তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিবেন না—সুতরাং দৃঢ়চিত্তে কার্য্যে অগ্রসর হইলেন।

চারিদিকে আত্মীয় কুটুম্ব দাস-দাসীগণ ঘিরিয়া—মধ্যস্থলে কেশবচন্দ্র। তিনি হঠাৎ সবলে তাহাদের মধ্য হইতে সরিয়া আসিয়া নিজের পত্নীকে কহিলেন—"দেখ, এই মুহূর্ত্ত মহা-পরীক্ষার চরম সময়, হয় তুমি সকল বাধা পদতলে দলিয়া আমার সঙ্গে চলিয়া এস, নয় জন্মের মত আমাকে ছাড়িয়া গুরুজনের অনুগত হইয়া এখানে বাস কর। কাহারও এমন সাধ্য নাই যে মহা-সত্যের পথ হইতে আমাকে বিচলিত করে। আমি এই চলিলাম।" কেশবচন্দ্র বীরদাপে এমনভাবে হঠাৎ গিয়া সদর মুক্ত করিলেন, যে কেহই বাধা দিতে পারিল না—হতভম্ব নির্ব্বাক স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কেশবচন্দ্র জলস্রোতের মত সবেগে বাহির হইয়া চলিলেন, কেহ আটকাইতে পারিল না। তখন তাঁহার পত্নী গুরুজনের ভয়, লজ্জা সঙ্কোচ সকল ছাড়িয়া স্বামীর পিছনে পিছনে চলিলেন। কাহাকেও

গ্রাহ্য করিলেন না—সকলে স্তব্ধ হইয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত নির্ব্বাক দাঁড়াইয়া রহিল, একটি কথাও কহিতে পারিল না।

সপত্নী কেশবচন্দ্র যখন চিরকালের মত সমাজের অর্গল ভাঙ্গিয়া বাটীর বাহির হইলেন, তখন তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধব সকলেই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিল, তিনি হিন্দুসমাজ হইতে চিরকালের মত বিচ্যুত হইলেন। সে বাড়ীতে আবার আসিয়া ঢুকিবার পথ বন্ধ হইয়া গেল। মাতা অঞ্চলে চক্ষের জল মুছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র সে সব কোন বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। পত্নীকে পরম সমাদরে সঙ্গে লইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

সেদিন ইংরাজী ১৮৬২ সালের ১৩ই এপ্রেল। সেই শুভদিনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দিয়া, সর্ব্বসমক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের পদে অভিষিক্ত করিলেন। সেদিন ব্রাহ্মসমাজে মহা ধূমধামে উপাসনা ও আনন্দোৎসব সম্পন্ন হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

কেশবচন্দ্র সস্ত্রীক সমাজচ্যুত হইলেন, গৃহ হইতে তাড়িত হইলেন, পৈতৃক বাড়ীতে আর প্রবেশ করিবার অধিকার রহিল না। তখন তিনি পত্নীর সহিত কিছুদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাড়ীতে রহিলেন, তারপরে কলু-টোলায় একটি ছোট বাড়ী ভাড়া লইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এইখানে তিনি ভয়ানক ক্ষতরোগে আক্রান্ত হইলেন। দেবেন্দ্র-নাথ বিস্তর ব্যয় করিয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। পাঁচবার অস্ত্র চিকিৎসার পরে তিনি সারিয়া উঠিলেন। তাঁহার সেইরূপ পীড়ার অবস্থা দেখিয়া বাড়ীর লোকের মন নরম হইল, প্রাণে পূর্ব্ব-স্নেহ জাগিল—তাহারা আবার কেশবচন্দ্রকে গৃহে লইতে চাহিল। এই বাটীতেই কেশবচন্দ্রের

প্রথম পুত্র করুণাচন্দ্র জন্মিল। তাহার পর তিনি স্ত্রী-পুত্র লইয়া—কয়েক মাস পরে—আবার পৈতৃক ভবনে প্রবেশ করিলেন।

আবার সেই পৈতৃক ভিটায় হিন্দুর সংসারে বৈষ্ণবের গৃহে গিয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে থাকিয়াও নিজের ধর্ম্ম-মত হইতে এক পা বিচলিত হইলেন না। সেই বাড়ীতে—ব্রাহ্মধর্ম্মের নিয়ম অনুসারেই পুত্রের জাত-কর্ম্ম সম্পন্ন করাইলেন। বহু চেষ্টা করিয়াও বাড়ীর লোকেরা কেহ সে কার্য্যে বাধা জন্মাইতে পারিল না। এই দিনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অন্যান্য ব্রাহ্মগণকে লইয়া তাঁহার কলুটোলার বাড়ীতে আসিয়া উৎসবে যোগ দিলেন। এই সব কারণে বাড়ীর কর্ত্তা সে দিন বাড়ী ছাড়িয়া অন্য জায়গায় চলিয়া গেলেন। উৎসব শেষ হইয়া গেলে তবে আবার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য কেশবচন্দ্র চারিদিকে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং মফঃস্বলের নানা সহরে বেড়াইয়া ধর্ম্ম-প্রচার করিতে লাগিলেন। যে বিষয়ে লোক মন প্রাণ ঢালিয়া সাধনা করে সেই বিষয়েই সিদ্ধ হইয়া থাকে। কেশবচন্দ্রের এমন চমৎকার বক্তৃতা-শক্তি জন্মিয়াছিল যে যাহারা তাঁহার বক্তৃতা শুনিত—তাহারাই মন্ত্র-মুগ্ধের মত তাঁহার পিছু পিছু ছুটিত। ইহার ফলে দেশ-বিদেশের লোকের মনে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি ক্রমশঃ ভক্তি ও আস্থা জন্মিতে লাগিল।

তারপর কেশবচন্দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সিংহলে গমন করিলেন। এতদিন এত করিয়াও, তাঁহাতে যেটুকু হিন্দুর হিন্দুত্ব ছিল বা জাতির গৌরব ছিল—এইবারে সেটুকু ঘুচিল। এইবারে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার জাতি গেল।

সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া কেশবচন্দ্র খৃষ্টানদের সঙ্গে 'ধর্ম্ম' লইয়া তর্ক ও বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে খৃষ্টধর্ম্মের

অত্যন্ত প্রসার-প্রতিপত্তি চলিয়াছিল—অনেক শিক্ষিত যুবক সেই দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন, অনেক সম্ভ্রান্ত বিদ্বান্ লোক খৃষ্টান হইয়াছিলেন। তারপর কেশববাবু যখন হইতে বক্তৃতা ও উপদেশ প্রভৃতি দিতে আরম্ভ করিলেন, তখন হইতে—খৃষ্টানদের সে প্রতিপত্তি বড়ই কমিয়া গেল, সকলেই সে দিক ছাড়িয়া কেশববাবুর ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকেই ঝুঁকিল। এই কারণে পাদ্‌রী সাহেবেরা তাঁহার উপর বড়ই চটিয়া গেলেন এবং 'ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম' মিথ্যা—ভুল-ধর্ম্ম বলিয়া রটাইতে লাগিলেন। তখন কেশবচন্দ্র আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না—তর্ক, যুক্তি, পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্র আলোচনায় ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য খৃষ্টানদের সঙ্গে তর্ক ও বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন।

সেই সময়ে তিনি কৃষ্ণনগরে হাওয়া-বদল করিতে গিয়া ৺মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে ছিলেন। সেইখানে বিখ্যাত পাদ্‌রী সাহেব 'ডাইসনের' সঙ্গে তাঁহার প্রথম ধর্ম্ম-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তর্ক, বিচার ও বক্তৃতার ধূম পড়িয়া গেল, কেশববাবুর বিচার ও বক্তৃতা-শক্তি দেখিয়া সকলেই স্তব্ধ হইয়া গেলেন—পাদ্‌রী সাহেব শেষে পরাজয় মানিয়া লইয়া পলাইলেন—কেশবচন্দ্রের জয়-জয়কার পড়িয়া গেল। নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলী সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন।

তারপর রেভারেণ্ড লালবিহারী দে মহাশয় তাঁহার সঙ্গে বিচার করিতে আসিলেন। কেশববাবু অদ্ভুত বিচার ও বক্তৃতা-শক্তি দ্বারা তাঁহাকেও জয় করিলেন। তখন খৃষ্ট-ধর্ম্মের পসার নিতান্ত কমিয়া গিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের পশার বাড়িতে চলিল। পাদ্‌রীরা নিরাশ হইয়া পড়িলেন, আর কেহ ভয়ে তাঁহার সহিত ধর্ম্ম-বিচার করিতে অগ্রসর হইলেন না। ইহার দিনকতক পরে কেশবচন্দ্র আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে "ব্রাহ্মসমাজ সমর্থন" নামে একটি বক্তৃতা করিলেন। সেই বক্তৃতা

শুনিয়া মহাত্মা 'ডফ্' সাহেব সর্ব্ব সমক্ষে কহিলেন—"ব্রাহ্মধর্ম্ম যথার্থ ই মহাশক্তিসম্পন্ন সত্য ধর্ম্ম বটে!"

ইহার পরে তিনি কলুটোলার বাড়ীতে "সঙ্গীত-সভা" নাম দিয়া একটি সভা স্থাপন করিলেন, সেখানে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম, সমাজ-সংস্কার, চরিত্র-সংশোধন প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা হইতে লাগিল। "ধর্ম্ম-সাধন" নামক বই লিখিয়া তাহাতে সেই সভার উপদেশ এবং বক্তৃতা সকল ছাপাইলেন। তারপরে তিনি 'ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান' নামে একখানি বই লিখিলেন। সেই বই প্রচার হইবার পরে দেবেন্দ্রনাথ পৈতা ছাড়িলেন এবং ব্রাহ্মমতে কন্যার বিবাহ দিলেন।

সেই সময়ে কেশববাবু ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার হস্তে সমাজের সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কেশববাবুর প্রভুত্ব অনাহতভাবে চলিল। তিনি সমাজের আগাগোড়া সংস্কার করিয়া ব্রাহ্মদের জন্য যে আইন-কানুন নিয়ম প্রভৃতি করিয়া দিলেন, তাহার ফলে ইংরাজী ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট তারিখে এদেশে হিন্দুদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম অসবর্ণ বিবাহ আরম্ভ হইল। বৈদ্যজাতীয় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ গুপ্তের সঙ্গে একটি বিধবা বৈষ্ণব-কন্যার বিবাহ হইল, আরও দুইটি অজ্ঞাত কুলশীল যুবক যুবতীরও ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে বিবাহ হইয়া গেল। এই ব্যাপার লইয়া সমাজের মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল—মনোবিবাদের সূত্রপাত হইল।

কেশববাবু সমাজের সকল কায একাকী সম্পন্ন করিয়াও একদণ্ড নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম করিতে পারিলেন না!—নানা স্থানে ধর্ম্ম-প্রচার করিবার চেষ্টায় ব্রতী হইলেন। ইংরাজী ১৮৬৪ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে গমন করিলেন।

ইহার পূর্ব্বে ঐ সকল দেশের লোক 'ব্রাহ্মধর্ম্মের' নাম পর্য্যন্ত

শুনে নাই, কেশবচন্দ্র গিয়া সর্ব্বপ্রথম প্রচার আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া বিস্তর লোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল—অনেকে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

সেখান হইতে ফিরিয়া আসার পর ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আত্ম-বিবাদ প্রবলভাবে আরম্ভ হইল। বিস্তর লোক ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিতরে হিন্দুর অনেক প্রকার ক্রিয়া-কলাপ আচার-পদ্ধতি বজায় রাখিবার জন্য পণ করিল, কিন্তু কেশববাবুর দলের সকলেই সে সকল একেবারে মুছিয়া দিয়া সমস্ত নূতন নিয়ম চালাইবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিল। এই নূতন নিয়মের মধ্যে—অসবর্ণ বিবাহ, পৈতা পরিত্যাগ প্রভৃতি কতকগুলি নিয়ম প্রাচীন লোকেরা কিছুতেই মানিতে চাহিল না, সুতরাং বিবাদের মীমাংসা না হইয়া বরং বাড়িতেই লাগিল।

ক্রমে সেই বিবাদ এমন হইয়া দাঁড়াইল যে সেখানে আর দুই দলে একসঙ্গে থাকা চলিল না। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের মতের এবং দলের ব্রাহ্মগণ আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

এই ব্যাপারে—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আশ্রয় পরিত্যাগ করায়—কেশবচন্দ্রের অত্যন্ত দুরবস্থা উপস্থিত হইল, কিন্তু তিনি তাহা মোটেই গ্রাহ্য করিলেন না। আদি সমাজ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া তিনি নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের চেষ্টায় রহিলেন এবং একদিন শিয়ালদহ রেলওয়ে ষ্টেশনে "ব্রাহ্মসমাজের স্বাধীনতা ও উন্নতির জন্য সংগ্রাম" বিষয়ে একটি বৃহৎ বক্তৃতা করিলেন। সেইস্থানে বহুলোক সমবেত হইয়াছিল। বক্তৃতা শুনিয়া অনেকেই কেশববাবুর পক্ষে যোগ দিল, তাঁহার দল বাড়িতে লাগিল।

তারপরে তিনি বড়বাজার সিঁদুরিয়াপটীর গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে দুইদিন দুইটি বক্তৃতা করিলেন, তাহার ফলেও অনেক লোক

তাঁহার সহায় হইল। তৎপরে, ইংরাজী ১৮৬৬ সালের ১১ নবেম্বর "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" নামে নূতন সমাজ স্থাপিত করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে এই নূতন সমাজ স্থাপন করার পর হইতে তিনি প্রকাশ্যভাবে অহোরাত্র প্রচারকার্য্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। কলিকাতার নানাস্থানে, এবং ভবানীপুর, কালীঘাট, শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া, হুগলী প্রভৃতি স্থানে ক্রমাগত বক্তৃতা করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

ইংরাজী ১৮৬৬ সালের ৬ই মে কেশববাবু মেডিক্যাল কালেজের থিয়েটার গৃহে "যীশুখৃষ্ট ইউরোপ এবং এসিয়া" বিষয়ে একটি চমৎকার বক্তৃতা দিলেন। তাহা শুনিয়া পাদরী সাহেবেরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, ভাবিলেন—ইঁহার ধর্ম্মমত যীশুখৃষ্টের ধর্ম্মমত হইতে বড় তফাৎ নহে, সম্ভবতঃ ইনি শীঘ্রই খৃষ্টান হইবেন। এই বক্তৃতায় এত জ্ঞানের কথা ছিল—ধর্ম্মতত্ত্ব এমন সহজ সরল ও সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে সভ্য ও বিদ্বানগণের সমাজে তাঁহার যশ ও গৌরব অত্যন্ত বাড়িয়া গেল।

এমন কি খবরের কাগজে কেশববাবুর এই বক্তৃতা পড়িয়া তখনকার গবর্ণর জেনারেল 'স্যর জন্ লরেন্স' বাহাদুর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং কলিকাতায় আসিয়াই কেশববাবুকে ডাকাইয়া পরিচয় গ্রহণ ও বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন।

তিনি সেই সময় হইতেই কেশবচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, নিজে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বিস্তর বড় বড় পণ্ডিত ও রাজকর্ম্মচারিগণের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলেন। ইহার কিছুদিন পরে

কুমারী 'মেরী কার্পেণ্টার' এ দেশে আসিয়া লাট সাহেবের বাটীতেই রহিলেন এবং কেশবচন্দ্রকে সেইখানে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া খাওয়াইলেন। এই উপলক্ষে তাঁহার সঙ্গেও বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল এবং লাট-সাহেবের সঙ্গে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব আরও বাড়িল। ইহার পরে কিছু দিনের জন্য তিনি গবর্ণমেণ্ট ট্যাঁকশালের দেওয়ানী পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

সেই বৎসরের ২৮শে ডিসেম্বর কেশবচন্দ্র "মহাপুরুষ" (Great man) নামে আর একটি বক্তৃতা দিলেন। সেই বক্তৃতা শুনিবার পর হইতে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে প্রকৃত মহাপুরুষ বলিয়াই ভাবিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে মিশিলেন।

সেই বৎসরের শেষে তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয়দ্বয়কে সঙ্গে লইয়া ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য গমন করিলেন। এবং এই সময়েই "প্রকৃত বিশ্বাস" (True Faith) নামক পুস্তক লিখিলেন।

পর বৎসর তিনি বিহার, অযোধ্যা ও পঞ্জাবপ্রদেশে গিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। যখন যেস্থানে গমন করিলেন, সেইখানের লোকেরাই তাঁহার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অনুগত হইয়া পড়িতে লাগিল। পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা 'ম্যাক্‌লিয়ড্‌' বাহাদুর তাঁহার অদ্ভুত শক্তি ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিলেন, এমন কি নিজের বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন।

সেখান হইতে প্রচার-কার্য্য শেষ করিয়া আসিয়া কেশবচন্দ্র আপনার কলুটোলার বাড়ীতে, তাঁহার দলের ব্রাহ্মগণকে লইয়া দৈনিক উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল উপাসনায় সর্ব্বপ্রথম গানের সঙ্গে পাখোয়াজ বাজনা বাজানো আরম্ভ হইল।

তাহার পরে তিনি শান্তিপুরে গিয়া বাংলাভাষায় 'ভক্তি' বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন। সেই বক্তৃতার পর হইতে ব্রাহ্মদের মধ্যে জ্ঞানের সঙ্গে

প্রাণের ভক্তি আসিয়া মিশিল। সেই বৎসর মাঘমাসে তিনি সর্ব্বসাধারণ ব্রাহ্মগণের সঙ্গে মিলিয়া মাঘোৎসব করিলেন। সেই উৎসব উপলক্ষে সর্ব্বপ্রথম কলিকাতার রাজপথে ব্রাহ্মগণের নগরসংকীর্ত্তন বাহির হইল।

উৎসবের শেষে সন্ধ্যার পর সকলে গিয়া গোপাল মল্লিকের বাটীতে সমবেত হইলেন, এইখানে কেশবচন্দ্র "নবজীবনপ্রদ বিশ্বাস" নামে বক্তৃতা করিলেন। এই সভায় সস্ত্রীক বড়লাট এবং আরো অনেক উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ও কয়েকজন বিখ্যাত পাদরী সাহেব উপস্থিত ছিলেন। কেশববাবুর বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এই উৎসব শেষ করিয়া কেশববাবু মুঙ্গেরে গেলেন, সেখান হইতে দ্বিতীয়বার বোম্বাই গমন করিলেন, সেখান হইতে ফিরিয়া আবার কিছুদিনের জন্য সপরিবারে মুঙ্গেরে বাস করিতে লাগিলেন। এইখানে ব্রহ্ম-উপাসনা এবং সাধন-ভজন খুব ধূমধামে চলিতে লাগিল—সমস্ত মুঙ্গের সহর মাতিয়া উঠিল, তাঁহার শিষ্যগণ প্রকাশ্যে তাঁহাকে "মহাপুরুষ" "অবতার" প্রভৃতি বলিয়া তাঁহার সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করিল।

তারপরে সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বিলাত যাত্রার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ইতিপূর্ব্বেই বিলাতে তাঁহার নাম খুব বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিল। সংবাদপত্রে তাঁহার বক্তৃতা, প্রবন্ধ এবং উপদেশ প্রভৃতি পড়িয়া সেখানে বিস্তর বড় বড় পণ্ডিত, রাজপুরুষ এবং ধার্ম্মিক পাদরী সাহেবেরা তাঁহাকে দেখিবার জন্য এবং তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। অনেকে সেখান হইতে তাঁহাকে পত্র লিখিয়া বিলাত যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। কেশবচন্দ্র সেইসকল পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না—বিলাত যাওয়া স্থির করিলেন।

কিন্তু তিনি অতি দরিদ্র ধর্ম্ম-প্রচারক, দেশে কষ্টে-স্বষ্টে দিন

চলে। বিলাত যাইবার জন্য অত অর্থ কোথায় পাইবেন? ভাবিয়া চিন্তিয়া বিলাত যাইবার অর্থসংগ্রহের জন্য কেশবচন্দ্র টাউনহলে এক প্রকাশ্য সভা করিয়া "ভারতের সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধ" নামে সুন্দর বক্তৃতা দিলেন। সেই সভা হইতে তাঁহার ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা চাঁদা উঠিল। ঐ টাকা বিলাতগমন পক্ষে অতি সামান্য—কিন্তু তাহাই অবলম্বন করিয়া ইংরাজী ১৮৭০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কেশবচন্দ্র বিলাত-যাত্রা করিলেন।

লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া তিনি অনেক বড় বড় ইংরাজ পণ্ডিত, রাজপুরুষ এবং 'ইউনিটারিয়ান' সভা কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইলেন। ঐ সভার উদ্যোগে তাঁহার আহ্বানের জন্য এক বৃহৎ সম্বর্দ্ধনা-সভা হইল। একমাত্র ক্যাথলিক-খৃষ্টান সম্প্রদায় ছাড়া আর সকল সম্প্রদায়ের সকল বড় বড় লোকই সেই সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার সম্মান করিলেন।

সেই সভায় বিলাতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বড় বড় বক্তারা বক্তৃতা করিয়া যেমন তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন, তিনিও তেমনি চমৎকার রকম বক্তৃতা দিয়া সকলকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। এই বক্তৃতাদ্বারা তাঁহার নাম, খ্যাতি ও যশ সমগ্র ইংলণ্ডে ছড়াইয়া পড়িল। 'গ্রাফিক' নামক বিখ্যাত পত্রিকায় কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা, জীবনী এবং ছবি প্রকাশিত হইল, তিনি ইংলণ্ডের পরম সম্মান ও গৌরবের বস্তু হইয়া উঠিলেন। "ইউনিটারিয়ান" সভার সম্পাদক রেভারেণ্ড্ স্পিয়ার্স সাহেব তাঁহাকে নিজের বাটীতে লইয়া গিয়া সসম্মানে রাখিলেন।

ইংলণ্ডের বড় বড় লোকেরা তাঁহাকে এত ভালবাসিল ও স্নেহ করিতে লাগিল যে তাঁহাকে অর্থ, অলঙ্কার, নানাবিধ পুস্তক ও শিল্পদ্রব্য প্রভৃতি উপহার দিয়া ভালবাসা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। এই উপায়ে তাঁহার বিস্তর অর্থ আয় হইতে লাগিল। নহিলে—তিনি যে রকম গরীব—তাহাতে বিলাতে গিয়া বাস করা তাঁহার পক্ষে কিছু-তেই সম্ভবপর হইত না।

কেশবচন্দ্র এক গির্জ্জায় "ঈশ্বর প্রাণের প্রাণ" নামে এক সুন্দর বক্তৃতা এবং উপদেশ দিলেন। সেইদিন সেখানে বিস্তর পণ্ডিত, সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ এবং 'মিস্ কাব্' নামে এক বিদুষী ধার্ম্মিকা যুবতী উপস্থিত ছিলেন। ভাল ভাল ধর্ম্মযাজকগণও শুনিতে আসিয়াছিলেন। বক্তৃতা ও উপদেশ শুনিয়া সকলেই মোহিত হইয়া গেলেন—কেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালবাসা বাড়িল।

তারপরে তিনি ক্রমে ক্রমে অন্যান্য গির্জ্জায় গিয়া "অপব্যয়ী পুত্র", "প্রার্থনা", "ঈশ্বর-প্রেম" "সাধারণ-শিক্ষা" প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করিতে এবং উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। দুই একজন জ্ঞানী মানী, সম্ভ্রান্ত ধর্ম্ম-প্রচারক এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে কেশবচন্দ্রের মুখের উপর সকলের সাক্ষাতে মুক্তকণ্ঠে কহিলেন—"সত্য বলিতেছি সেন মহাশয়, আপনার পদতলে বসিয়া আমাদের সকলের শিক্ষা করা উচিত।" এরূপ সৌভাগ্য আজ পর্য্যন্ত অন্য কোন ব্যক্তির ঘটিয়াছে কি ?

তারপর তিনি, মদ্যপান ও যুদ্ধনিবারিণী সভা, দাতব্যসভা, শ্রমজীবী-সভা, অন্ধ ও বধিরদের আশ্রম প্রভৃতি নানা স্থানে গিয়া বক্তৃতা ও উপদেশ দিতে লাগিলেন। 'সেণ্ট্ জেমস্ হলে' পাঁচ হাজার শ্রোতার সম্মুখে, বৃটিশরাজের সুরা-ব্যবসায়ের দোষ দেখাইয়া এক তীব্র বক্তৃতা করিলেন। তারপর "স্পার্জ্জন্স্-টেবারনেকল্" নামক স্থানে এক বৃহৎ সভা হইল। সেই সভার সভাপতি হইলেন মহাত্মা লরেন্স। এই সভায় কেশবচন্দ্র "ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য" নামে এক সুন্দর দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। এই বক্তৃতাকালে ভারতবর্ষে নীচশ্রেণীর সাহেবদের অত্যাচারের কথা তীব্র ভাষায় জানাইলেন। তাহাতে এদেশের অনেক সাহেব তাঁহার উপর চটিলেন, কিন্তু সেখানকার বড় বড় সাহেবেরা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন।

তারপর তিনি "খৃষ্ট ও খৃষ্ট-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে এক আশ্চর্য্যরকম

চমৎকার বক্তৃতা করিলেন, তাহাতে খৃষ্ট-ধর্ম্মের অনেক গূঢ়তত্ত্ব এবং মহত্ত্ব প্রচারিত হইল। ইহা শুনিয়া সমস্ত পাদরী সাহেবেরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং ইংলণ্ডের 'সুইডেনবর্গ সভা' তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র এবং অনেকগুলি প্রেততত্ত্ব বিষয়ের সুন্দর পুস্তক ও চিত্র উপহার দিলেন।

১১ই জুন তিনি লণ্ডন সহর ছাড়িয়া 'ব্রিষ্টলে' গমন করিলেন এবং 'মিস্ কাবের' বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। এই স্থানে রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি-মন্দির দর্শনপূর্ব্বক সেখানে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মৃত মহাত্মার আত্মার মঙ্গল উদ্দেশে প্রার্থনা করিলেন।

সেইখানে তাঁহার পীড়া হইল, সেই অবস্থাতেই লিভারপুল গিয়া বক্তৃতা ও উপদেশ দিলেন, তারপরে আবার লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

এইবারে লণ্ডনে ফিরিয়া আসার পর তিনি তথা হইতে বাহির হইয়া একে একে 'এডিনবরা', 'গ্লাসগো', 'লিড্স্', 'অক্সফোর্ড' প্রভৃতি স্থানে গিয়া বক্তৃতা ও উপদেশ দিতে লাগিলেন। অক্সফোর্ডে মহাপণ্ডিত মোক্ষমূলারের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ ও পরিচয় হইল। পণ্ডিতবর তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক পরম সমাদরে নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন। তারপর জন ষ্টুয়ার্ট মিল, নিউম্যান, কাউয়েল প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত-মণ্ডলীর সহিত তাঁহার পরিচয় ও বন্ধুত্ব হইল। সকলেই তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া অস্‌বর্ণ-রাজপ্রাসাদে ছিলেন। তিনি কেশবচন্দ্রের গুণ, গৌরব, শক্তি ও যশের কথা শুনিয়া তাঁহাকে প্রাসাদে লইয়া গিয়া পরিচয় করিলেন। রাজকুমার লিওপোল্ড্ এবং রাজকুমারী

লুই মাতার সঙ্গে ছিলেন। সকলেই কেশবচন্দ্রের উপর পরম সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার প্রতি তাঁহাদের সকলেরই এমন প্রবল স্নেহ জন্মিল যে মহারাণী স্বয়ং তাঁহাকে নিজের একখানি চিত্রপট ও তাঁহার স্বামীর দুই-খানি জীবনী উপহার দিলেন—তাহাতে নিজের হাতে তাঁহার নাম লিখিয়া দিলেন। রাজকুমার কেশবচন্দ্রের হস্তাক্ষর চাহিয়া লইলেন। কেশব-চন্দ্র এই আকাশকুসুমবৎ উচ্চ-গৌরব ও সম্মান লাভ করিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে তাঁহার পত্নীর একখানি চিত্র উপহার প্রদান করিলেন।

বাঙ্গালীর কথা দূরে থাকুক—কোন্ দেশের কোন্ লোকের ভাগ্যে এমন গৌরব, সম্মান ও সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে? কেশবচন্দ্র সমস্ত বাঙ্গালীজাতিকে গৌরব ও সম্মানে ভূষিত করিয়া গিয়াছেন।

স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। মহামতি গ্লাড্‌ষ্টোন, ডিন্ ষ্টান্‌লী প্রভৃতি বিশ্ব-বিখ্যাত বড় বড় রাজপুরুষেরাও তাঁহাকে নিজ নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক খাওয়াইয়া তাঁহার সম্মান ও গৌরব বর্দ্ধিত করিলেন।

এইরূপে বাঙ্গালীর ছেলে কেশবচন্দ্র বিলাতে গিয়া ছয়মাস অবস্থানপূর্ব্বক অসাধ্য-সাধন করিয়া ১৮ই সেপ্টেম্বর সেস্থান ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিলেন। ২০শে অক্টোবর তারিখে হাওড়ায় আসিয়া পৌঁছিলেন। কেশবচন্দ্রের বিলাত গমনের পূর্ব্বে সেখানে 'ব্রাহ্ম-সমাজ' ছিল না—তাঁহার সে দেশ হইতে চলিয়া আসিবার পর, সেখানে ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপিত হইল। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরব—কম সৌভাগ্যের কথা নহে।

বিলাত হইতে ফিরিয়া কেশবচন্দ্র দেশের সকল বড় বড় লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে আরম্ভ করিলেন—তাহাতে একটা বড় উপকার হইল। এখানকার বিস্তর লোকের 'ব্রাহ্মসমাজে'র উপর যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল তাহা দূর হইয়া গেল।

তারপর ১৮৭০ সালে কেশবচন্দ্র "ভারত-সংস্কারক" নামক সভা

স্থাপন করিলেন, এই সভা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইল। সুলভ সাহিত্য বিভাগ, শ্রমজীবীদের শিক্ষা বিভাগ, স্ত্রী-বিদ্যালয় বিভাগ, দাতব্য বিভাগ এবং সুরাপান-নিবারিণী বিভাগ স্থাপিত হইয়া সকল রকমে দেশের মঙ্গল কার্য্যসকল করিতে লাগিল। "সুলভ-সমাচার" নামে এক পয়সা দামের একখানি খবরের কাগজ এই সভা হইতে কেশববাবু বাহির করিলেন। তাহাতে দেশের বিস্তর উপকার হইতে লাগিল।

স্ত্রী-বিদ্যালয়ে দেশীয় স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখিতে লাগিলেন। সুরাপান-নিবারিণী বিভাগ হইতে "মদ না গরল" নামে একখানি পত্রিকা যথানিয়মে প্রকাশিত হইয়া বিনামূল্যে বাড়ী বাড়ী বিতরিত হইতে লাগিল, তাহার ফলে অনেক পানাসক্ত ব্যক্তি শোধরাইয়া গেলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে "ইণ্ডিয়ান মিরার" নামক সংবাদ পত্রকে কেশবচন্দ্র দৈনিক করিয়া দিলেন। এই সময়ে আদি সমাজের সহিত কেশববাবুর সমাজের আবার মিলন হইবার প্রস্তাব চলিতে লাগিল, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হইল না।

তারপরে কেশবচন্দ্র 'ভারত আশ্রম' নামে গরীবদুঃখীদের জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিলেন, কিন্তু বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য যে পাঁচ বৎসরের বেশী ইহা রহিল না। কর্ম্মচারীদের অন্যায় আচরণে তাহা উঠিয়া গেল। ইহার কারণ বাঙ্গালীজাতির জাতিগত হিংসা।

কেশবচন্দ্র নিজের চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও প্রতিভাবলে দেশ-দেশান্তরে রাজার অপেক্ষাও যে সম্মান ও গৌরব লাভ করিয়া সকলের চেয়ে বড় হইলেন—ইহা হিংসুক বাঙ্গালীর প্রাণে সহিল না। সকল কার্য্যে—সকল বিষয়ে—সকল ব্যাপারে একচেটিয়া ক্ষমতা লাভ করিয়া নিজের কর্ত্তৃত্ববলে কেশবচন্দ্র যে সব মহৎ কার্য্য করিতে লাগিলেন—তাহাতে বিস্তর লোকের অন্তর জ্বলিতে লাগিল। তাহারা কেশবচন্দ্রকে অপদস্থ করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

কেশববাবুর স্থাপিত "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে" স্ত্রী-পুরুষে একত্রে মিলিয়া উপাসনা করিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা পর্দ্দার আড়ালে পৃথক্ স্থানে বসিতেন। সমাজের অধিকাংশ লোকের ইচ্ছা যে স্ত্রীলোকগণ পৃথক্ স্থানে পর্দ্দার আড়ালে থাকিতে পাইবে না। পর্দ্দা দূর করিয়া দিয়া প্রকাশ্য ভাবে স্ত্রী-পুরুষে একত্রে বসিয়া উপাসনা করিবে, নহিলে স্ত্রীজাতির এবং ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি হইবে না।

কেশবচন্দ্র এ নিয়ম চালাইতে কিছুতেই মত দিলেন না। তিনি নানারকম যুক্তি, তর্ক ও বিচার পূর্ব্বক বুঝাইয়া দিলেন যে এ দেশে সেরূপ প্রথা হওয়া উচিত নহে, তাহাতে সমাজের বিস্তর ক্ষতি হইবে, নানা-রকম গোলোযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা, ধর্ম্মের পথে পাপের প্রসার বিস্তার হইতে পারে। স্ত্রীলোকগণকে পর্দ্দার আড়ালে পৃথক্ আসনে রাখাই কর্ত্তব্য এবং তাহাই রাখিতে হইবে।

কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী'। কেশবচন্দ্রের সেই কথায় তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষ ক্ষেপিয়া উঠিল, তাহারা সে নিয়ম কিছুতেই পালন করিবে না—সাহেবদের মত স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে আনিয়া একত্রে বসিয়া, দাঁড়াইয়া উপাসনা করিবে, নহিলে তাহারা সে সমাজে থাকিবে না।

এইরূপে বিবাদ আরম্ভ হইয়া দিন দিন গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। তারপর কুচবেহারের রাজার সঙ্গে কেশববাবুর কন্যার বিবাহ হওয়াতে, এই দলের লোকেরা বড়ই সুবিধা পাইল, নানা রকমে তাঁহার নিন্দা রটাইতে লাগিল, আর কিছুতেই তাঁহার আধিপত্য মানিয়া চলিতে চাহিল না। তখন দুইটি দল হইল, একদল কেশববাবুর দিকে রহিল—অন্যদল নূতন সমাজ স্থাপন করিবার চেষ্টায় রহিল। এইরূপে "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" ভাঙ্গিয়া গেল।

নূতন দলের লোকেরা "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" নাম দিয়া একটি নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিল এবং অনেক পণ্ডিত, জ্ঞানী ও বড় বড় লোককেও জুটাইয়া লইল। কেশবচন্দ্র তখন তাঁহার সমাজের "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" নাম তুলিয়া দিয়া নাম করিলেন—"নববিধান ব্রাহ্মসমাজ।"

কেশবচন্দ্র নিজে বিশেষ চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া "এ্যালবার্ট" হল স্থাপন করেন। তাঁহার শৈশবের সেই সর্ব্বপ্রথম পাঠশালা যেখানে ছিল—সেইখানে এই অট্টালিকা স্থাপিত হইল। তারপর 'মোড়পুকুর' গ্রামে 'সাধনকানন' নাম দিয়া একটি মনোহর বাগান প্রস্তুত করাইলেন—সেইখানে শক্তি-প্রিয় সাধু ব্রাহ্মণগণ গিয়া পরম শান্তি লাভ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে গবর্ণর জেনারেল "লর্ড লিটন" বাহাদুরের অনুরোধে কেশবচন্দ্র কলিকাতার টাউনহলে "ধর্ম্মে বিজ্ঞান ও উন্মত্ততা" নামে সুন্দর বক্তৃতা দিলেন। সেই বৎসর মান্দ্রাজে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল—সহস্র সহস্র লোক অনাহারে মরিতে লাগিল। তাহাতে কেশবচন্দ্রের করুণ প্রাণ গলিয়া গেল। তিনি বিশেষ চেষ্টা ও প্রাণপাত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এক বিরাট সভা করিলেন এবং করুণ ভাষায় চমৎকার বক্তৃতা করিয়া সকলের হৃদয় গলাইয়া দিলেন। সেই সভায় অনেক টাকা চাঁদা উঠিল, কেশববাবু সেই সমস্ত টাকা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যে পাঠাইয়া দিলেন।

তারপর তিনি কলিকাতায় অপার সারকিউলার রোডের উপর "কমল-কুটীর" নামক বাড়ী কিনিলেন এবং সেই বৎসরের ২৮শে কার্ত্তিক তারিখে কলুটোলার পৈতৃক বাটী ছাড়িয়া 'কমল-কুটীরে' গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্রের যে সকল শিষ্য-সেবক ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উন্নতি ও বিস্তারের জন্য জীবন দান করিয়া প্রচারক হইয়াছিলেন,

তাঁহারা বড়ই দরিদ্র—ঘরবাড়ী বা কোনরকম নির্দ্দিষ্ট থাকিবার স্থান ছিল না। এজন্য তাঁহাদিগকে বড়ই কষ্ট পাইতে হইত। কেশববাবু 'কমল-কুটীরের' পার্শ্বে 'মঙ্গলবাড়ী' নামক বাড়ী করিয়া প্রচারক ব্রাহ্মগণের সপরিবারে বাস করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' ভাঙ্গিয়া 'সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের' সৃষ্টি হইল—এই ব্যাপারে তাঁহার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। সে আঘাত তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না—পীড়িত হইয়া পড়িলেন। সেই কাল রোগ আর সারিল না, মহাপুরুষকে দিন দিন মৃত্যুর পথে টানিয়া লইয়া চলিল।

দিনকতক ব্যারাম একটু কমিল, চিকিৎসকেরা তাঁহাকে জল-ভ্রমণের ব্যবস্থা দিল। সেই উপলক্ষে তিনি নৌকা করিয়া শারদীয় পূর্ণিমাতে গঙ্গার উপরে সংকীর্ত্তন উপাসনা, গঙ্গার অর্চ্চনা এবং উৎসব করিলেন। সেইসময়ে দক্ষিণেশ্বরবাসী সিদ্ধপুরুষ মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আসিয়া কেশবচন্দ্রের সেই উৎসবে যোগ দিলেন—সোণায় সোহগা মিলিল। সেই হইতে পরমহংসদেব কেশবচন্দ্রকে অত্যন্ত ভালবাসার চক্ষে দেখিলেন, এমন কি মাঝে মাঝে তাঁহার বাড়ীতে গিয়াও দেখাশুনা করিয়া আসিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে কেশববাবু সেই পীড়িত অবস্থায় থাকিয়াও অনেকগুলি ছোট ছোট পুস্তক লিখিয়া প্রকাশ করিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে বিনা-মূল্যে বিলি করিতে লাগিলেন। তারপরে এ দেশের স্ত্রীলোকগণকে বিদ্যা, জ্ঞান, ধর্ম্ম ও গৃহকার্য্যে সুশিক্ষিত করিবার ইচ্ছায় তিনি 'আর্য্য নারী-সমাজ' নামে একটী সভা স্থাপন করিলেন।

তারপরে নানা স্থানে আরও কয়েকবার বক্তৃতা দিয়া তিনি অনেকগুলি লোককে প্রচারক নিযুক্ত করিয়া বাঙ্গলা দেশের চারিদিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পাঠাইলেন। তারপর পুত্রের প্রতি সংসারের

সকল ভার অর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক গোঁফ ও মাথা মুড়াইলেন, গেরুয়া পরিলেন এবং ভিক্ষার ঝুলি গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে তিনি 'বিধান-ভারত' নামক পুস্তক লিখিলেন।

তারপরে ইংরাজী ১৮৮১ সালের ২৪শে মার্চ্চ "নববিধান" নামক ইংরাজী পত্রিকা বাহির করিলেন এবং ব্রাহ্ম-বিদ্যালয় ও স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার জন্য অশেষ চেষ্টা ও পরিশ্রমে 'ভিক্টোরিয়া' কলেজ স্থাপন করিলেন। এই সময়ে "পরিচারিকা", "বালকবন্ধু" প্রভৃতি আরও কতকগুলি পত্রিকা বাহির হইল।

তার পরবৎসর 'নববিধান' সমাজের বাৎসরিক উৎসব শেষ করিয়া কেশবচন্দ্র বহুমূত্র রোগে পড়িলেন। ব্যারামের প্রথমেই তিনি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন, অনেক রকম চিকিৎসায় একটু আরাম হইয়াই ডাক্তার কবিরাজের পরামর্শে তিনি দারজিলিং গমন করিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়া পীড়ার কিছুমাত্র উপশম হইল না—বরং বাড়িল; তিনি আবার কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

এখানে আসিয়া সেই অবস্থাতেই তিনি 'নব-বৃন্দাবন' নাটক লিখিয়া অভিনয় করিলেন। সে অভিনয় এত চমৎকার হইল যে কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত বড়লোক তাঁহাকে নিজ নিজ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক লইয়া গিয়া সেই নাটক অভিনয় দর্শন করিলেন।

তারপরেও এক বৎসর সেই পীড়ার অবস্থাতেই কাটিল। পরবৎসর, সমাজের বাৎসরিক উৎসবের দিনে কেশবচন্দ্র টাউনহলে "ইউরোপের নিকট এসিয়ার সংবাদ" নামে শেষ বক্তৃতা করিলেন। অবশেষে উৎসবের পরে তিনি সপরিবারে হাওয়া বদলের জন্য সিমলা পাহাড়ে গমন করিলেন। পথকষ্টে ব্যারাম বাড়িল। সিমলায় চিকিৎসা করাইয়া কতকটা সুস্থ হইলেন, অমনি "নবসংহিতা" নামক পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সকাল হইতে দুপর পর্য্যন্ত ক্রমাগত

লিখিয়া তাহা ডাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া উপাসনায় বসিলেন। সেইরূপ শরীরের অবস্থায় এইরূপ অতিরিক্ত পরিশ্রমে ব্যারাম আবার বাড়িয়া গেল। সেই অবস্থাতেই আমেরিকার এক ভদ্রলোকের অনুরোধে 'যোগ' নামক এক প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার ব্যারাম আর কমিল না, বাড়িয়াই চলিল। ইংরাজী ১৮৮৩ সালের অক্টোবর মাসের প্রথমে তিনি ভগ্ন শরীরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

পীড়া দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কেশবচন্দ্র নিজ বাটীতে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন—তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। শরীরের অবস্থা বুঝিয়া ভয় পাইয়া তিনি সেই অসম্পূর্ণ মন্দিরই প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহাকে চেয়ারে বসাইয়া ধরাধরি করিয়া মন্দিরে আনা হইল। সেই অবস্থাতেই এ জীবনের মত সেই শেষ আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিলেন. তারপর সেই দিন সকলের সঙ্গে মিলিয়া একত্রে জীবনের শেষ উপাসনা ও প্রার্থনা করিয়া লইলেন।

তখনও তাঁহার জননী বাঁচিয়া ছিলেন। তিনি রোগ-যন্ত্রণায় বিষম ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে বিছানায় শুইয়া শুইয়াই বারম্বার জননীর পদধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে লাগিলেন।

ক্রমে ব্যারাম বাড়িয়া ৭ই জানুয়ারী তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া গেল। পরদিন মঙ্গলবার সকাল ৯টা ৫৩ মিনিটের সময় বঙ্গদেশ অন্ধকার করিয়া মাতা, পত্নী, পুত্র, পরিজন, শিষ্যসেবক সকলকে শোকের সাগরে ভাসাইয়া ইহজীবনের মত চক্ষু বুজিলেন!

সম্পূর্ণ।